বিজ্ঞান (www.bigyan.org.in) – এর
কিছু বাছাই লেখার সংকলন

যারা বিজ্ঞান
ভালবাসে, বা
ভয় পায় তাদের জন্য

বিজ্ঞান পত্রিকা

ষষ্ঠ সংখ্যা | ডিসেম্বর ২০১৬

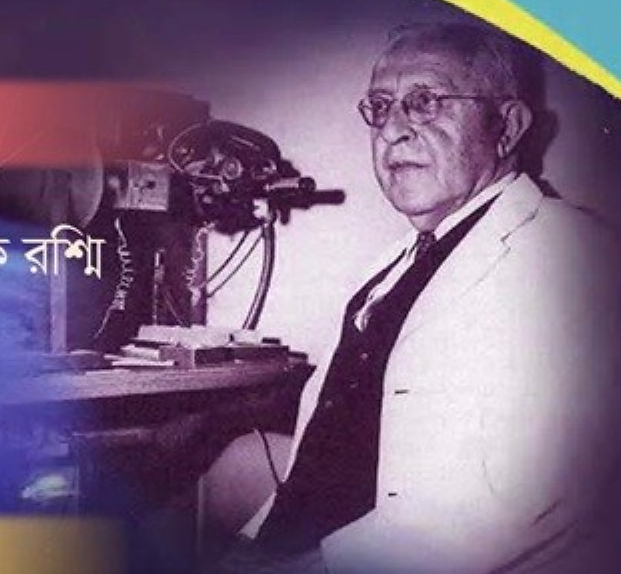

কিছু ইতিহাস

ভিক্টর হেস ও মহাজাগতিক রশ্মি

জীবন বিজ্ঞান

ডিপ্রেশন

পদার্থবিদ্যার কিছু বিস্ময়

ছায়াপথ

যারা বিজ্ঞান
ভালবাসে, বা
ভয় পায় তাদের জন্য

বিজ্ঞান পত্রিকা

ষষ্ঠ সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০১৬

www.bigyan.org.in-এর বাছাই করা লেখার সংকলন

'বিজ্ঞান' সম্বন্ধে জানতেঃ

ওয়েবসাইট - www.bigyan.org.in
ফেসবুকের পাতা - https://www.facebook.com/bigyan.org.in

ইমেইল - bigyan.org.in@gmail.com

সূচীপত্র

গাছেদের যুদ্ধ

অমলেশ রায় ০৭

গাছ বলতে মনের মধ্যে ভেসে ওঠে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বনস্পতি অথবা দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ মাঠ। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ মনে হলেও, চোখের আড়ালে গাছের একেকটি প্রজাতি অপর প্রজাতিদের ধ্বংস করে সাম্রাজ্য বিস্তার করার পরিকল্পনা রচে চলেছে। সেই কাহিনী লিখেছেন অমলেশ রায়।

ডিপ্রেশন

ড: তনয় মাইতি ১০

ডিপ্রেশন কথাটা আমরা আকছার ব্যবহার করে থাকি, কিন্তু সবসময় সঠিকভাবে প্রয়োগ করি কি? ড: তনয় মাইতি জানাচ্ছেন, আর কি কি মনের অসুখ দেখে ডিপ্রেশন বলে ভুল হতে পারে। কেন এরকম ভুল খুব সহজেই হতে পারে এবং তার থেকে সতর্ক থাকার উপায় কি, সেই পথও বাতলাচ্ছেন তিনি।

ছায়াপথ

রানা খান ১৬

চাঁদহীন অন্ধকার রাত্রে মেঘমুক্ত আকাশের দিকে তাকালেই লক্ষ্য করবেন অগণিত তারার মেলা। প্রাচীন কালে মানুষ এই নক্ষত্রগুচ্ছকে মনে করত স্বর্গের সিঁড়ি। এখন আমরা একে "ছায়াপথ নক্ষত্র-জগৎ" বা "মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি" নামে জানি। চাকতির আকারে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ১০ হাজার কোটি নক্ষত্র, মাঝখানে হয়ত একটি কৃষ্ণগহ্বর। এই নক্ষত্র-জগতের নাড়িনক্ষত্র নিয়ে লিখেছেন রানা খান।

ভিক্টর হেস ও মহাজাগতিক রশ্মি

জয়দীপ মিত্র ২২

রবিঠাকুর লিখেছিলেন "আলোকের এই ঝরনা ধারায় ধুইয়ে দাও" আলোকের ঝরনা ধারাই বটে, কিন্তু সে ঝরনা শুধু সূর্যালোকস্নাত তা নয়, সে ঝরনা-রশ্মির আগমন অনন্ত, অসীম মহাজগৎ থেকে - নাম তাই মহাজাগতিক রশ্মি। অবিরাম ধারাস্রোতের মতো তা ঝরে পড়ছে পৃথিবীপৃষ্ঠে-প্রতিমুহূর্তে কোটি কোটি কণা ভেদ করে যাচ্ছে আমাদের শরীর-প্রায় সম্পূর্ণটাই আমাদের অগোচরে। মহাজাগতিক রশ্মির আবিষ্কর্তা ভিক্টর হেসের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন জয়দীপ মিত্র।

সূচীপত্র

রাত্রির অন্ধকারে নর্দমার দুর্গন্ধের উৎস

সব্যসাচী সরকার ২৯

নর্দমার কাদা থেকে পচা ডিমের দুর্গন্ধ বের হয়। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে। দিনের আলোতে সেই গন্ধ মিলিয়ে যায়। এমনটি কেন? এর উত্তর খুঁজতে চলে যেতে হবে ৫৭-কোটি বছর আগে যখন শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বাতাসে অক্সিজেন ছিল না। সেই খোঁজেই নেমেছেন সব্যসাচী সরকার।

অঙ্ক কি শক্ত

পার্থসারথি মজুমদার ৩৩

অঙ্ক মানেই একটা বিভীষিকা। স্কুলপড়ুয়াদের রাতের ঘুম কেড়ে নেয়। আচ্ছা? অঙ্ক শেখা কি মজাদার হতে পারে না? একদম সেই ছোট্টবেলা থেকেই, যখন দশটা সংখ্যা নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, শিখছি যোগ-বিয়োগ। সেই প্রশ্নই তুলেছেন অধ্যাপক পার্থসারথি মজুমদার।

সম্পাদকীয়

মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার আনন্দ ভাগ করে নিতে যাত্রা শুরু হয়েছিল 'বিজ্ঞান' পত্রিকার। সারা পৃথিবী জুড়ে বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে যে বিপুল কর্মযজ্ঞ ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত, তার খুঁটিনাটি যাতে বাংলাভাষী ছাত্র ছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমরা, অর্থাৎ 'বিজ্ঞান' পত্রিকার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত প্রতিটি মানুষ সেই চেষ্টাটুকুই করে চলেছি। পরীক্ষা পাশের জন্য নয়, বরং নিছক ভালো লাগা থেকে যদি পাঠকেরা বিজ্ঞান পড়ে, বিজ্ঞান নিয়ে ভাবে, সেটাই হবে 'বিজ্ঞান' পত্রিকার সবচেয়ে বড় সাফল্য ।

সকলের সহযোগিতায় পত্রিকার ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত বোধ করছি।

এবারে আসি আমাদের পত্রিকার এই সংখ্যায় প্রকাশিত লেখাগুলির কথায়।

অসীম অনন্ত মহাকাশে ছড়িয়ে রয়েছে অগুনতি গ্রহ-তারা-ছায়াপথ। আর তার মাঝে একমেবাদ্বিতীয়ম আমাদের এই পৃথিবী। পৃথিবীর বাইরে অন্য গ্রহে প্রাণের সন্ধানে বহুদিন ধরেই নানা গবেষণা করে চলেছেন বিজ্ঞানীরা। প্রাণ কি শুধুই পৃথিবীতে - এ কৌতূহল আজকের নয়। চারপাশে প্রাণের এত কোলাহল দেখে মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কোথা থেকে এলো এত প্রাণ? আজ পৃথিবীব্যাপী বিজ্ঞানের এই জয়জয়কারের যুগে, কতটুকু জানতে পেরেছি আমরা এই পৃথিবীকে? এখনো কি কি জানা বাকি?

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরাকে আমরা পরবর্তী প্রজন্মের বাসের অযোগ্য করে তুলছি দিনের পর দিন। গ্লোবাল ওয়ার্মিং, গ্লোবাল ডিমিং-এর পর বর্তমানে গ্লোবাল ব্রাউনিং নামক এক নতুন সমস্যা বিজ্ঞানীদের চিন্তায় ফেলেছে। দূষণের জেরে বেড়ে চলা পৃথিবীর গড় উষ্ণতা (গ্লোবাল ওয়ার্মিং), সূর্যালোকের ভূপৃষ্ঠে কম মাত্রায় পৌঁছানো (গ্লোবাল ডিমিং), বিশ্বব্যাপী স্বচ্ছ জলের ক্রমশ ঘোলা হয়ে যাওয়া (গ্লোবাল ব্রাউনিং) ইত্যাদি সমস্যার কারণে জীবজগতের অস্তিত্ব আজ সঙ্কটাপন্ন। প্রখ্যাত পদার্থবিদ স্টিফেন হকিং-এর মত অনুযায়ী, মানবসভ্যতাকে আরও ১০০০ বছর বাঁচিয়ে রাখতে হলে এই ধ্বংস হতে বসা গ্রহ থেকে পালানো ছাড়া আর পথ নেই। তাঁর মতে ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে আমাদের মহাকাশ অভিযান চালিয়ে যেতে হবে পুরোদমে। কবিগুরুর ভাষায় বলতে গেলে 'মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে' যদি আমরা খুঁজে বার করতে পারি আমাদের নতুন ঠিকানা, যদি ব্যাগপত্র গুছিয়ে পাড়ি দিতে পারি 'আকাশ ভরা সূর্য তারা'র মাঝে, মানবসভ্যতার ইতিহাসে তা হবে এক অবিস্মরণীয় অবদান।

এই তারায় ভরা আকাশের কথা রয়েছে এই সংখ্যার 'ছায়াপথ' প্রবন্ধে।

আবার, এই তারাময় মহাকাশ থেকে প্রতি ক্ষণে ঝরে পড়ছে অনেক অনেক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা - মহাজাগতিক বা কসমিক রশ্মি হিসাবে। এই কণাগুলোর অনেকেই আকাশ বাতাস আর আমাদের ফুঁড়ে চলে যাচ্ছে মহাবিশ্বের এপার থেকে ওপারে। কসমিক রশ্মির আবিষ্কর্তা অস্ট্রিয়ার বিজ্ঞানী ভিক্টর হেস প্রয়াত হয়েছিলেন ডিসেম্বর মাসেই (১৯৬৪ সালের ১৭ই ডিসেম্বর)। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে এই সংখ্যায় রয়েছে 'ভিক্টর হেস ও মহাজাগতিক রশ্মি' লেখাটি।

প্রযুক্তিনির্ভর বর্তমান সমাজে সাফল্যের ইঁদুরদৌড়ে সামিল হতে গিয়ে মানুষ দিন দিন আরও একা হয়ে পড়ছে। এই ভয়ানক একাকীত্ব থেকে জন্ম নিচ্ছে শারীরিক, মানসিক নানাধরনের অসুখ । যার মধ্যে একটা নাম আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে, সকালে খবরের কাগজ থেকে শুরু করে রাত্রে টেলিভিশন স্ক্রীন - তা হল ডিপ্রেশন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) - এর তথ্য অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে এই মুহূর্তে ৩৫ কোটি মানুষ এই অসুখে ভুগছেন। প্রতি বছর প্রায় ৮ লক্ষেরও বেশি মানুষ ডিপ্রেশনজনিত কারণে আত্মহননের পথ বেছে নেন। এই সংখ্যায় আমরা প্রকাশ করেছি ডিপ্রেশন রোগের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত। প্রচলিত ভুল ধারণা, অর্থাৎ যে কোনো মনের অসুখ মাত্রেই যে ডিপ্রেশন নয়, সেটা সমাজের প্রতিটি মানুষের জানা বড় প্রয়োজন।

নদীর স্রোতের অনুকূলে নৌকার বেগ অথবা তৈলাক্ত বাঁশে বাঁদরের ওঠানামা - অঙ্ক দেখলে ভয় করে না এরকম ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা বোধহয় খুব কম নয়। সেই অঙ্কের সাথে কী করে বন্ধুত্ব পাতানো যায় তার হদিশ নিয়ে আমরা হাজির বিজ্ঞানের এই সংখ্যায় 'অঙ্ক কি শক্ত' লেখাটিতে।

বর্তমান পৃথিবীর একটি জ্বলন্ত সমস্যা - যুদ্ধ। যুদ্ধ বলতে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে শয়ে শয়ে মানুষ, হাতে ধারালো মারণাস্ত্র। নিরীহ সাধারণ মানুষ যুদ্ধ করে পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে, আত্মরক্ষার তাগিদে। ঠিক একইভাবে গাছও যুদ্ধ করে, নিজের প্রাণ বাঁচাতে। কে না জানে, গাছেরও প্রাণ আছে ? রহস্যময়ী প্রকৃতির এ আর এক অজানা বিস্ময়, গাছেদের যুদ্ধ, যা এবার ধরা দিয়েছে 'বিজ্ঞান' এর পাতায় ।

দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট ঘটনাগুলোর পেছনের বিজ্ঞানসম্মত কারণগুলো বুঝতে পারলে বিজ্ঞানকে আরও সহজে আমরা ভালোবাসতে পারবো, শুধু বইয়ের পাতায় নয়, বিজ্ঞান ছড়িয়ে আছে সর্বত্র, রাস্তাঘাট থেকে খেলার মাঠ। যাতায়াতের রাস্তায় নর্দমা খোঁড়াজনিত সমস্যা, দুর্গন্ধ ইত্যাদি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অতিপরিচিত ঘটনার আড়ালের বিজ্ঞানটা আমরা কজন জানি? কেন শুধুমাত্র রাতের অন্ধকারেই নর্দমার দুর্গন্ধ পাওয়া যায়, দিনের আলোয় নয় ? জানতে হলে পড়তে হবে বিজ্ঞান পত্রিকার ষষ্ঠ সংখ্যা।

আশা রাখি 'বিজ্ঞান' পত্রিকার এই সংখ্যা প্রিয় পাঠকদের নিরাশ করবে না। আপনাদের মতামত জানান আমাদের ইমেইল করে (bigyan.org.in@gmail.com-এ)।

সম্পাদকমন্ডলী, 'বিজ্ঞান'
ডিসেম্বর ২০১৬

‘বিজ্ঞান’-এর সম্পাদনায় যারা আছি

- কুণাল চক্রবর্ত্তী (ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস, ব্যাঙ্গালোর)
- কাজী রাজীবুল ইসলাম (ইনস্টিটিউট ফর কোয়ান্টাম কম্প্যুটিং, ওয়াটার্লু বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা, ওয়েবসাইট)
- দিব্যজোতি ঘোষ (অ্যাডোবি, সান হোসে, ক্যালিফোর্ণিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় (ম্যাথওয়ার্কস, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- অর্ণব রুদ্র, সিনিয়র (NGO পদক্ষেপ ও ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ‘বিজ্ঞান’-এর কো-অর্ডিনেটর)
- অর্ণব রুদ্র, জুনিয়র (NGO পদক্ষেপ ও ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ডেভিস, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- শাওন চক্রবর্তী (হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- কাজী ফারহা ইয়াসমিন (আই বি এম, কলকাতা)
- আবির দাস (ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটস, লোয়েল, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- সুমন্ত্র সরকার (ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- সূর্যকান্ত শাসমল (কগনিজেন্ট টেকনোলজি সলিউশনস, কলকাতা, ‘বিজ্ঞান পত্রিকা’-র প্রযুক্তি সম্পাদক)
- নীলাব্জ চ্যাটার্জী (ইউনিভার্সিটি অফ অসলো, নরওয়ে, ‘বিজ্ঞান পত্রিকা’-র প্রযুক্তি সম্পাদক)
- চিরঞ্জীব মুখার্জী (হরিশচন্দ্র রিসার্চ ইনস্টিটিউট, এলাহাবাদ)
- দীপ্যমান প্রামাণিক (হরিশচন্দ্র রিসার্চ ইনস্টিটিউট, এলাহাবাদ)
- ঝুমা সন্নিগ্রাহী (ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট, ড্রেসডেন, জার্মানী)
- অমলেশ রায় (ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর কোল রিসার্চ, জার্মানী)
- কৌশিক ব্যানার্জী (ইনটেল, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- সুদীপ্ত ব্যানার্জী (NGO পদক্ষেপ ও এমপ্লয়ী বেনিফিট রিসার্চ ইনস্টিটিউট, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- শিলাদিত্য দেওয়াসি (NGO পদক্ষেপ ও কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ)
- শ্রীনন্দা ঘোষ (NGO পদক্ষেপ ও টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি ড্রেসডেন, জার্মানী, ‘বিজ্ঞান পত্রিকা’-র কো-অর্ডিনেটর)
- অমিয় মাজি (পারডিউ ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- ধ্রুবজ্যোতি সিনহা (আই. এম. আর. বি. ইন্টারন্যাশনাল, ক্যান্টার গ্রুপ)
- এবং সহযোগিতা করছেন বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা অনেক বাঙালী বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান প্রেমী।

‘বিজ্ঞান পত্রিকা‘-র সম্পাদনা – শ্রীনন্দা, সূর্যকান্ত, নীলাব্জ, কুণাল, অর্ণব, অনির্বাণ, ধ্রুবজ্যোতি, ও রাজীবুল

প্রচ্ছদ ও পত্রিকার নকশা - সূর্যকান্ত

ইপাব পত্রিকা : নীলাব্জ

গাছেদের যুদ্ধ

অমলেশ রায়

গাছ বলতে মনের মধ্যে ভেসে ওঠে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বনস্পতি অথবা দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ মাঠ। আপাত দৃষ্টিতে গাছকে নিরীহ মনে হলেও তা যে সত্যি নয় সেটা কিছু কিছু কল্প বিজ্ঞানের গল্পে বা সিনেমায় আমরা দেখেছি। তাছাড়া পতঙ্গভুক গাছেদের নাম ইতিমধ্যে কারো কারো মাথায় চলে এসেছে এতক্ষণে। গাছের গায়ে কাঁটা, বিষাক্ত রোঁয়া (যেমন, বিছুটি) এগুলো তাদের আত্মরক্ষার পরিচয় বহন করে। অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই তারা নানা "অস্ত্র-শস্ত্র" উঁচিয়ে সাবধান থাকে বিভিন্ন পশু-প্রাণীদের থেকে।

সুতরাং মলয় সমীরণে দুলকি দোলনরত গাছের পাতা-ডাল-ফুল দেখে কবিরা যতই উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রকৃতির রূপ বর্ণনা করুন না কেন যুক্তি-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে গাছ যথেষ্ট বাস্তববাদী ও কর্মনিষ্ঠ সে কথা বলাই যায়।

এ কথা বলার পর কেউ কেউ আমার পরবর্তী বাক্যবিন্যাসের প্রতি "উন্নাসিক" বিশেষণ ব্যবহার করে থাকেন। প্রথম প্রথম আমিও নিজেকে তাই ভাবতাম। যুক্তিটা এই রকম – "আরে মশাই, শুধু গাছ কেন ? যে কোন প্রাণশক্তিই নিজেকে বাঁচাতে সংগ্রাম করে। তাই বলে গাছকে আপনি হিংস্র বলতে পারেন না। ওরা তো নিজেদের মধ্যে কোন লড়াই করে না, যেমন অন্য পশুরা করে, মানুষ করে।"

প্রশ্ন যদি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ অর্থাৎ স্বজাতির দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে হয় তাহলে হয়তো একই ক্লাসের ফার্স্ট-সেকেন্ড হওয়ার লড়াই বলা যায়। দুজনের খাতা-বই-সিলেবাস ও প্রশ্নপত্র একই। সেক্ষেত্রে "হিংস্র" শব্দ অভিধানে তুলে রাখাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু পরিকল্পিত রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগে সংঘবদ্ধ একটি প্রজাতি যখন অন্য প্রজাতিকে ধ্বংস করে সাম্রাজ্য

বিস্তার করে তখন তার মধ্যে "হিংসা"-র ছাপ স্পষ্ট, আর এই বিশেষ প্রক্রিয়াকে "অ্যালেলোপ্যাথি" বলা হয়।

"অ্যালেলোপ্যাথি" হল গাছেদের পারস্পরিক অস্তিত্ব রক্ষার পদ্ধতি। এক রাসায়নিক পদার্থ "অ্যালেলোকেমিক্যাল", যার ব্যবহারে গাছ অন্য প্রজাতির গাছের পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে অনিষ্ট করে এবং নিজেদের প্রজাতির গাছকে সাহায্য করে। সূর্যমুখী গাছের পাতায় এই ধরনের রাসায়নিক পদার্থগুলোকে হেলিয়ানল নামে চিহ্নিত করা হয় আর কালো আখরোটের কুঁড়ি, মূল ও ফলের আবরণে জাগলোন থাকে। তাছাড়া ইউক্যালিপ্টাস, ধান, গম, শশা, কালো সরষে ইত্যাদি গাছেরা নিজেদের শরীর থেকে নানা রকমের "অ্যালেলো" রাসায়নিক পদার্থ নির্গত করে। রাসায়নিক পদার্থ গুলো সাধারণত ফেনলিক অ্যাসিড, ক্যুমারিন, টারপিনয়েড, ফ্ল্যাভনয়েড, অ্যালকালয়েড, গ্লাইকোসাইড, আইসোথায়োসায়ানেট বা গ্লুকোসিনোলেট প্রভৃতি ধরনের হয়ে থাকে। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত "দ্য এফেক্ট অফ প্লান্ট টু ইচ আদার" বইটিতে এ বিষয়টি প্রথম বিশ্লেষণ করেন অস্ট্রিয়ান অধ্যাপক হান্স মলিস এবং "অ্যালেলোপ্যাথি" শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। বিভিন্ন পদ্ধতিতে গাছ এই সব রাসায়নিক পদার্থ নির্গমন করে, যথা পাতা দ্বারা নির্গত বাষ্প, গাছ ধোয়া জল, মূল, গাছের জীর্ণ-পচা অংশ, বীজের নির্যাস ইত্যাদি।

বাড়ির ছোট্ট বাগানে বাজার থেকে কেনা কয়েকটি গাঁদা চারা লাগালাম। কদিন যেতে না যেতে দেখি আরো কত নাম না জানা আগাছা জন্মে গেছে। এই সব অলীক গাছগুলোকে আপনি তুলে ফেলুন, দেখবেন আবার হচ্ছে। ভদ্রতার খাতিরে যদি তা না করেন তাহলে আপনার "বাবুসোনা" গাঁদা চারাটি আপনার চোখের সামনে অপুষ্টিতে রুগ্ন "প্যালা"-র মত ফ্যালফ্যাল করে বাকি শীতকাল আপনার দিকে তাকিয়ে থাকবে।

কিছুদিন আগে "প্রসিডিংস অফ দ্য রয়াল সোসাইটি বি" (জানুয়ারী ৭, ২০১৪) পত্রিকায় একটি গবেষণা পত্রে প্রকাশিত হয়েছে যে, ফিজি দ্বীপপুঞ্জের সমুদ্র উপকূলে একটি কোরালের উপস্থিতিতে সেখানকার বিশেষ প্রজাতির সামুদ্রিক "আগাছা" গুলোর বিষাক্ত কোরাল ধ্বংসকারী "অ্যালেলোকেমিক্যাল" নির্গমনের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এহেন রাসায়নিক যুদ্ধে সামুদ্রিক "আগাছা" গুলির সামগ্রিক বৃদ্ধি হ্রাস পাচ্ছে আর নিরামিষাশী মাছেরা এগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বেশি পরিমাণে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করছে। এই গবেষণাটি কোরালের উপস্থিতিতে সামুদ্রিক "আগাছা"-দের "অ্যালেলোকেমিকল" বৃদ্ধির ঘটনাটি সামনে আনে। যদিও সামুদ্রিক আগাছাদের এই আচরণটি সাধারণ, না কি বিশেষ, তা গবেষণা সাপেক্ষ বলে দাবী করেছেন ওই বিজ্ঞানীরা। সাধারণত গাছেরা একটি নির্দিষ্ট আচরণ বিধি মেনে চলে, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে কোরালের উপস্থিতিতে "সামুদ্রিক-আগাছা"-দের নাটকীয় রূপ-বদল চোখে পড়ার মত বিষয়।

বর্তমানে বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা আগামী ভবিষ্যতে বাস্তুতন্ত্র সুস্থিত করার লক্ষ্যে যদি এই "অ্যালেলোকেমিক্যাল"-কে ব্যবহারিক প্রয়োগ করে পৃথিবী থেকে চিরতরে "কৃত্রিম রাসায়নিক আগাছানাশক" গুলোকে বর্জন করা যায়, ব্যাপারটা অনেকটা আমাদের টিকা দেওয়ার মত করে ভাবা যেতে পারে।

এবার ঠাণ্ডা মাথায় ভাবুন ব্যাপারটা। গাছেরা কেমন চুপচাপ আপনার-আমার সামনে দিব্যি হাওয়ায়

ডাল-পাতা দোলাতে দোলাতে পাশের গাছটির শ্রাদ্ধর আয়োজন করে। অথচ আমরা ভাবি, কী নির্বোধ! গাছ যদি চলতে-হাঁটতে পারতো তাহলে কথায়-কথায় তার ডাল ভাঙা, পাতা ছেঁড়া আর গাছ কাটার উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চয়ই দিত, দিতই।

লেখক পরিচিতি ('বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত হওয়ার সময়) :

লেখক ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনীয়রীং সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনোলজি, শিবপুর -এর সঙ্গে যুক্ত।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন http://bigyan.org.in/2014/03/20/gacheder-juddho/

প্রচ্ছদের ছবি: তন্ময় দাস (টাটা ইন্স্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ, মুম্বাই)

ডিপ্রেশন

ড: তনয় মাইতি

“সেরকম কিছু না, ওর একটু ডিপ্রেশন হয়েছে ডাক্তারবাবু”,

“এই যবে থেকে ডিপ্রেশন হয়েছে একটুও কথা বলছে না, ঘর থেকে বেরোচ্ছে না”, অথবা

“কেন যে ছেলেটার এত ডিপ্রেশন হল, দিব্যি ছিল, স্কুলে ভাল পড়াশুনাও করছিল, ... আমাদের ফ্যামিলিতে তো কোন অভাব নেই ডাক্তারবাবু, তবুও ছেলেটার (বা মেয়েটার) যে কি থেকে এমন ডিপ্রেশন হল ...”

এবং এরকম আরো অনেক।

রোজকার ডাক্তারী জীবনে প্রায়শই এমন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় আমাদের। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট মানুষটির বাড়ির লোক এসে জানায় যে তাদের প্রিয় মানুষটি ডিপ্রেশনে ভুগছে। ডাক্তারী পরিভাষায় যাকে ডিপ্রেশন বলা হয়, তার লক্ষণ বা প্রকাশ কিন্তু আদতে বিভিন্ন। তবে রোগ বা অসুবিধেটি যে ডিপ্রেশন বা ডিপ্রেশনজনিত সে বিষয়ে সাধারণ মানুষ দ্বিমত রাখে না।

ডিপ্রেশন কি?

যদি আমরা ডিপ্রেশনের খুব কাছাকাছি বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজতে চাই, সবার আগে আসবে ‘অবসাদ’ শব্দটি। অবসাদ – এই শব্দটির সাথে যে দুঃখ বা বিষাদ লেগে থাকে, সর্বনাশা রোগটিও ঠিক সেইরকমই। ডাক্তারী মতে যা ডিপ্রেশন বলে পরিচিত, তার পরতে পরতে জড়িয়ে থাকে মনখারাপ আর ভাল না লাগা। যে বিভিন্ন আঙ্গিকে ডিপ্রেশন বা অবসাদ রোগটিকে বোঝবার চেষ্টা করা হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-র দেওয়া নিয়মাবলী (গাইডলাইন)।

এই নিয়মাবলী অনুযায়ী, অবসন্ন মন (লো মুড), শক্তিহীনতা (লো এনার্জী) এবং উৎসাহহীনতা (লো ইন্টারেস্ট)-কে ডিপ্রেশনের আওতায় ফেলা হয়েছে। আরেকটু গভীরে গিয়ে, বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী অ্যারন বেক-এর তত্ত্ব অনুযায়ী, নিজের, পরিবেশের এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা (নেগেটিভ ভিউ)-র সম্মিলিত প্রকাশই হল ডিপ্রেশন। অবশ্য, শুধু নেতিবাচক ধারণা থাকলেই চলবে না, রোজকার জীবনে তার প্রভাবও পড়া চাই। বই-এর ভাষায় যাকে বলে - 'Significant Socio-occupational impairment'।

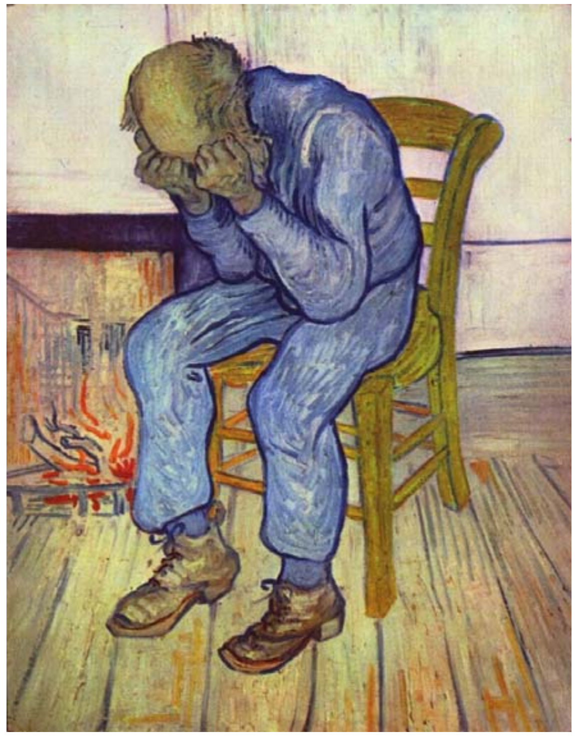

ভিনসেন্ট ভ্যান গ-এর ১৮৯০ সালের ছবি

মানসিক রোগ মানেই কি ডিপ্রেশন?

মনের অসুখ মানেই ডিপ্রেশন নয়। আপাতদৃষ্টিতে যাকে ডিপ্রেশন বলে মনে হচ্ছে, হতে পারে তা আসলে কোন জটিল রোগের বাহ্যিক লক্ষণমাত্র। এই ব্যাপারটা মনে রাখা একান্ত জরুরী, কারণ চিকিৎসা পদ্ধতি ও চিকিৎসার ফলাফল, দুটোই আলাদা হয় রোগের ক্ষেত্রবিশেষে।

বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী অ্যারন বেক-এর তত্ত্ব অনুযায়ী, নিজের, পরিবেশের এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণার সম্মিলিত প্রকাশই হল ডিপ্রেশন

চিকিৎসাবিজ্ঞানে ডিপ্রেশন বা ডিপ্রেশিভ এপিসোডকে সাধারণত দুইভাগে ভাগ করা হয় - ইউনিপোলার ডিপ্রেশন আর বাইপোলার ডিপ্রেশন। ডিপ্রেশনের গভীরতারও প্রকারভাগ আছে - অল্প (মাইল্ড), মাঝারী (মডারেট), বা গভীর (সিভিয়ার) হতে পারে। এর সাথে এসে জুড়ে বসতে পারে বিভিন্ন শারীরিক উপসর্গ। তবে আমরা, সাধারণ মানুষরা, যে দু-একটা লক্ষণ দেখে সহজেই 'ডিপ্রেশন হয়েছে', এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই, তা কিন্তু অনেকাংশেই ঠিক নয়।

কোন্ অসুখ বা মানসিক রোগ অবসাদ বা ডিপ্রেশন ডেকে আনতে পারে? সেই তালিকাটি বেশ লম্বা ও জটিল। এ বিষয়ে যে অসুখটির কথা সবার আগে বলা উচিত, তা হল স্কিজোফ্রেনিয়া। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এর নেতিবাচক লক্ষণগুলির (নেগেটিভ সিম্পটমগুলি) প্রকাশ। স্কিজোফ্রেনিয়ার নেতিবাচক লক্ষণগুলি মূলত চার প্রকার, যেমন:

১. চিন্তা করা বা কথা বলার ক্ষমতা কমে যাওয়া (অ্যালোগিয়া)

২. মনের বিভিন্ন ভাব প্রকাশের ক্ষমতা সঙ্কুচিত হওয়া (অ্যাফেক্টিভ ফ্ল্যাটেনিং)

৩. কোন কিছু ভাল লাগার ক্ষমতা কমে যাওয়া (অ্যানহেডোনিয়া/Anhedonia), এবং

৪. কোন কাজ শুরু করার ইচ্ছে হারিয়ে ফেলা (অ্যাভোলিসন/ Avolition)।

মুশকিলটা হয় এখানেই যে লক্ষণগুলি অনেক ক্ষেত্রেই ডিপ্রেশন রোগটির লক্ষণের মতন দেখতে লাগে। কিন্তু জৈবিকভাবে দুটি রোগ সম্পূর্ণ আলাদা এবং স্বাভাবিক ভাবেই চিকিৎসা পদ্ধতিও আলাদা।

জৈবিকভাবে স্কিজোফ্রেনিয়া ও ডিপ্রেশন সম্পূর্ণ আলাদা এবং চিকিৎসা পদ্ধতিও আলাদা

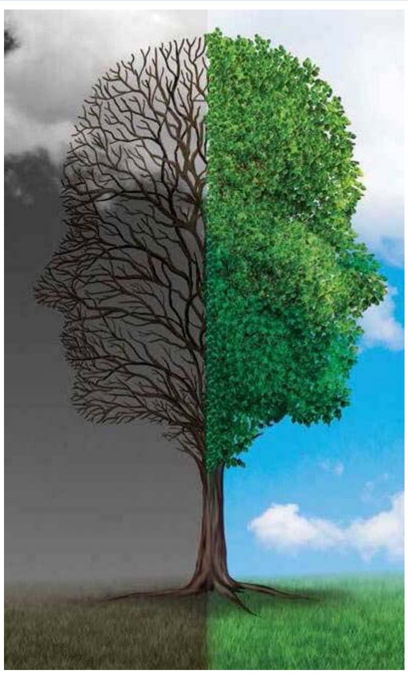

বাইপোলার ডিসঅর্ডারের উপর আমেরিকার NIH-এর পুস্তিকার প্রচ্ছদের অংশ (উইকিমিডিয়া)।

যে কোন রোগ নির্ণয় করতে দেরি হলে বা ভুল চিকিৎসা করলে, আসল রোগটি জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে। এমনকি সেই রোগ থেকে মস্তিস্কে স্থায়ী প্রভাব পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে (সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নার্ভ ইনজুরি বা স্নায়ুপ্রদাহ জনিত)। যার ফল মানসিক স্বাস্থ্যের প্রবল ক্ষতি থেকে প্রাণহানি, যেকোন কিছুই হতে পারে।

আরো যে রোগগুলিকে ডিপ্রেশন বলে ভুল ভাবা হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন শারীরিক রোগজনিত অবসাদ, নেশা ও নেশার বস্তুজনিত অবসাদ, পরিস্থিতির কারণজনিত অবসাদ। এর সাথে রোজকার ভালো-না-লাগা বা বহু প্রচলিত কথা 'মুড সুইং' তো আছেই। কিন্তু যেটা মনে রাখা দরকার সেটা হল ডিপ্রেশন রোগটি অনেক বেশি জটিল, সুদূর প্রভাব বিস্তারকারী, এবং অনেক বেশী ক্ষতিকারক, যদি না সঠিক সময়ে সঠিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে, যখন ডিপ্রেশন এত তীব্র হয় যে তাতে বাস্তব ভিত্তিহীনতা অবধি এসে যায়। বাস্তবে যা সত্যি নয়, সেরকম ধারণা মনের মধ্যে তৈরি হয় এবং রোগীর দৈনন্দিন জীবন সেই ধারণার দ্বারা পরিচালিত হয়।

চিকিৎসার উপায়

চিকিৎসাবিজ্ঞানের 'অ আ ক খ' হল পর্যবেক্ষণ। ডিপ্রেশনের চিকিৎসাও সেখান থেকেই শুরু হয়। চোখকান খোলা রাখা, রোগের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ নেওয়া ও লিপিবদ্ধ করাই হচ্ছে সঠিক চিকিৎসার প্রাথমিক সোপান। এটির আজও কোন বিকল্প নেই এবং ভবিষ্যতেও হয়তো থাকবে না। বিশেষতঃ মনোবিজ্ঞানে এই পারদর্শিতাটি রোগ নিরাময়ের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যেহেতু এখানে 'কথা'-ই রোগ-নির্ণয়ের উৎস, সেই 'কথা'-ই অনেকাংশে

রোগ নিরাময়ের উপায়ও। এই অনুশীলন ডাক্তারী পাঠক্রমের দ্বিতীয় বর্ষ থেকেই শুরু হয়। তবে রোজকার রোগী দেখা, তাদের কষ্টের কথা শোনা এবং বোঝার মাধ্যমেই এই বিশেষ ক্ষমতাটি আরো নিখুঁত হয়ে ওঠে।

মানসিক রোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা (history taking) যদিও অন্যান্য রোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার থেকে অনেকাংশেই আলাদা, মূল সারবস্তুটি কিন্তু একই: ক্রমানুসারে একের পর এক লক্ষণ ও সময়ের সাথে তার বেড়ে যাওয়া বা কমে যাওয়া নথিবদ্ধ করা, এবং সাথে সাথে সেই লক্ষণগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নথিবদ্ধ করা। এই আপাত নিরীহ কাজটিই অনেক সময় জটিল হয়ে ওঠে, যখন বিভিন্ন লক্ষণ একসাথে এসে উপস্থিত হয়, এবং অনেকদিন ধরে থাকার কারণে কোন্‌টি আগে এসেছিল এবং কোনটি পরে এসেছিল, সেটি মনে করতে রোগী বা রোগীর বাড়ির লোকদের অসুবিধে হয়, বা বহুক্ষেত্রেই ভুল হয়। এই বিষয়ে আরও যে কথাটি মনে রাখা দরকার তা হল 'temporal correlation of events'। অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটির জীবনে ঘটা বিভিন্ন ঘটনাগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও তার গুরুত্ব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অনুধাবন করা এবং সুচারুভাবে নথিবদ্ধ করাই এক অভিজ্ঞ মন-চিকিৎসকের বৈশিষ্ট্য। বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকলে তবেই এই বিশেষ ক্ষমতাটি আসে। বিভিন্ন ধরনের রোগী দেখা এবং ক্রমাগত অনুশীলনের মাধ্যমে এই ক্ষমতাটি আরো নিখুঁত হয়ে ওঠে। অধ্যয়ন ও অনুশীলনই হচ্ছে একজন চিকিৎসকের পথ চলার পাথেয় এবং এখানে শেখার কোন শেষ নেই।

চিকিৎসার পদ্ধতি হিসেবে আরো যে দুটি বিষয়ের উল্লেখ একান্তভাবে জরুরী তা হলো – এক, চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা নির্ণয় করা (অর্থাৎ ভর্তি করে নাকি আউটডোর হিসেবে চিকিৎসা প্রদান করা), এবং, দুই, আত্মহত্যা / স্বতঃপ্রণোদিত আঘাতের প্রবণতা থেকে সংশ্লিষ্ট রোগীকে রক্ষা করা। অসুখ চিনতে ভুল বা দেরী হলে এই দুটি বিষয়েই সিদ্ধান্ত নিতে অনেক সময় ভুল হতে পারে। অর্থাৎ বিপদের গুরুত্ব ও তার সম্ভাবনা নির্ণয় করাতে ঘাটতি থাকতে পারে যার ফলে মারাত্মক বিপর্যয় এমনকি প্রাণহানিও হতে পারে।

ডিপ্রেশনের চিকিৎসার জটিলতা

ডিপ্রেশন যতক্ষণ অব্দি মাঝারি আকারে থাকে, ততক্ষণ ওষুধের পরিবর্তে সাইকোথেরাপি বা কাউন্সেলিং করেও চিকিৎসা করা যায়। বিশ্বজুড়ে পরিসংখ্যান এটাই বলছে যে ওষুধের মাধ্যমে এবং বিনা ওষুধে চিকিৎসায় সাফল্যের হার প্রায় সমান। কিন্তু চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পূর্ণ বদলে যায় যখন ডিপ্রেশন রোগটি ভীষণ পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যখন অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট (antidepressant)-এর প্রয়োগ একান্তই প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। জটিলতার সৃষ্টি হয় যখন অন্য একটি রোগ ডিপ্রেশনের মতন উপসর্গ নিয়ে উপস্থিত হয়। যেমন, সাইকোসিস, বা 'বাস্তব এর সাথে যোগ না রাখা' রোগটির সঙ্গে ডিপ্রেশনের কিছু লক্ষণ সাধারণভাবে জড়িত থাকতে পারে। তখন সতর্ক ভাবে রোগীর অসুখের বিবরণ ক্রমানুযায়ী নথিবদ্ধ না করলে এবং সম্যকভাবে রোগটাকে না বুঝলে চিকিৎসায় মারাত্মক ভুল হয়ে যেতে পারে। যেমন, মূল রোগটি যদি সাইকোসিস (psychosis) হয়, সেখানে চিকিৎসার মূল মন্ত্রটি হল ওষুধ, যাকে ডাক্তারি পরিভাষায় অ্যান্টিসাইকোটিক (antipsychotic) ওষুধ বলা হয়ে থাকে। এই অ্যান্টিসাইকোটিক রাসায়নিক ভাবে

অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট (antidepressant) - এর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

যখন ডিপ্রেশন রোগটি ভীষণ এর পর্যায়ে পৌঁছে যায়, অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট (antidepressant)-এর প্রয়োগ একান্তই প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

খুব সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন আসতে পারে, দুটি আলাদা রোগ চিনতে এতখানি ভুল কিভাবে হয়? চিকিৎসকের অসতর্কতার বাইরেও আর একটা জিনিস আছে। মনের চিকিৎসার বহু ক্ষেত্রেই কোনখান থেকে রোগটি শুরু, তা ধরা অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। তার জন্য বহুলাংশেই বাড়ির লোক বা সাথে থাকা মানুষগুলির দেওয়া বক্তব্য বা পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করতে হয়। আর বাড়ির লোকের চোখে বেশিরভাগ অসুবিধেই ডিপ্রেশন হিসেবে ধরা দেয়; কারণ 'ডিপ্রেশন' কথাটি বহুল প্রচলিত (মনের অন্য অসুখ/অসুবিধে/রোগগুলির তুলনায়)। তাই, দুশ্চিন্তার সময়ে বাড়ির লোকদের বর্ণনাকে ঠিক মতন বিশ্লেষণ না করলে মারাত্মক ভুলটি হতে বিশেষ সময় লাগে না। পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে ওঠে যখন সাইকোসিসের লক্ষণগুলি (যেমন – কথা বলতে না চাওয়া, ঘরের মধ্যে একা একা বসে থাকা, খিদে কমে যাওয়া, ইত্যাদি) আপাতদৃষ্টিতে ডিপ্রেশনের মতন দেখতে লাগে। চিকিৎসা পদ্ধতির এই কঠিন বাঁকে এসে সঠিক পথ চিনে নেওয়া চিকিৎসকের পক্ষে মোটেও সহজ কাজ হয় না। চিকিৎসকের দক্ষতা, বিবেচনা, বোধ ও অভিজ্ঞতাই মূলধন হয়ে দাঁড়ায় তখন।

> সাইকোসিস, বা 'বাস্তব এর সাথে যোগ না রাখা' রোগটির সঙ্গে ডিপ্রেশনের কিছু লক্ষণ সাধারণভাবে জড়িত থাকতে পারে।

এ না হয় গেলো একটি অসুখের সাথে অন্যটিকে গুলিয়ে ফেলার কথা। বাকি আর কোন কোন মানসিক অসুখ একইরকম সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে? এ প্রসঙ্গে আর যে দুটি অসুখের কথা না বললেই নয়, তা হলো অ্যাডজাস্টমেন্ট ডিসঅর্ডার (adjustment disorder) এবং ডিসোসিয়েটিভ ডিসঅর্ডার (dissociative disorder)। এদের লক্ষণগুলিও অবসাদের মতন লাগতে পারে শুরুতে, কিন্তু দু-ক্ষেত্রেই কাউন্সেলিং বা সাইকোথেরাপি বা কথাবার্তার মাধ্যমে চিকিৎসা আসলে কার্যকরী হয়। বিশেষত, ডিসোসিয়েটিভ ডিসঅর্ডার রোগটির ক্ষেত্রে কাউন্সেলিং পদ্ধতি অনেকাংশেই আলাদা।

অবশেষে: অন্যান্য অসুখ থেকে ডিপ্রেশনের সূত্রপাত

এতক্ষণ বললাম তথাকথিত 'বিশুদ্ধ' মনোবিজ্ঞানের অসুখগুলির কথা। এই লেখায় আর যা না বললে লেখাটি সম্পূর্ণ হবে না, তা হলো অন্যান্য মেডিক্যাল বা শারীরবৃত্তীয় অসুখগুলি থেকে ডিপ্রেশন হওয়া। অসুখ হলে আমাদের সকলেরই খুব মন খারাপ হয়, কিন্তু কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে তা আলাদা করে অবসাদ রোগটির (clinical depression) আকার নিতে পারে, যার জন্য আলাদাভাবে চিকিৎসার প্রয়োজন

হয়। উল্লেখ্য তালিকাটি বেশ লম্বা, তবে যে অসুখগুলির কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখা দরকার তা হলো ডায়াবেটিস, কিডনীর ক্রনিক অসুখ, কিছু প্রকার ক্যান্সার, বিভিন্ন প্রকার সংক্রামক রোগ – যেমন এডস্, এবং গ্রন্থি জনিত অসুখগুলি যেমন থাইরয়েড ও প্যারাথাইরয়েড জনিত অসুখগুলি। শুনতে অবাক লাগলেও ক্ষেত্রবিশেষে বিভিন্ন প্রকার ওষুধও ডিপ্রেশন-এর লক্ষণগুলি ডেকে আনতে পারে। যেমন রক্তের লিপিড কম করার ওষুধ (স্ট্যাটিনস্), বিভিন্ন হার্ট-এর অসুখের ওষুধ, কেমোথেরাপির ওষুধ। এ সব ক্ষেত্রে সবচেয়ে আগে মূল অসুখ বা কারণটিকে চেনা দরকার, তারপর সম্পূর্ণ চিকিৎসা (দরকার হলে ঔষধ সহকারে) করা প্রয়োজন; কারণ মূল আগুনটি যতক্ষণ না নেভানো হচ্ছে, ততক্ষণ ধোঁয়া বন্ধ হবে না।

লেখক পরিচিতি ('বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত হওয়ার সময়):

লেখক কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করে বর্তমানে ভেল্লোরের খৃষ্টান মেডিক্যাল কলেজের সাইকিয়াট্রি (মনোচিকিৎসা) বিভাগে রেজিস্ট্রার পদে নিযুক্ত। মন এবং মানসিক স্বাস্থ্য, এই দুটি বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে তিনি খুবই আগ্রহী।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন http://bigyan.org.in/2016/08/15/depression/

প্রচ্ছদের ছবি: শিল্পী – রামিজ রেজা।

“The flawed teenager: tumbler” দ্বারা অনুপ্রাণিত।

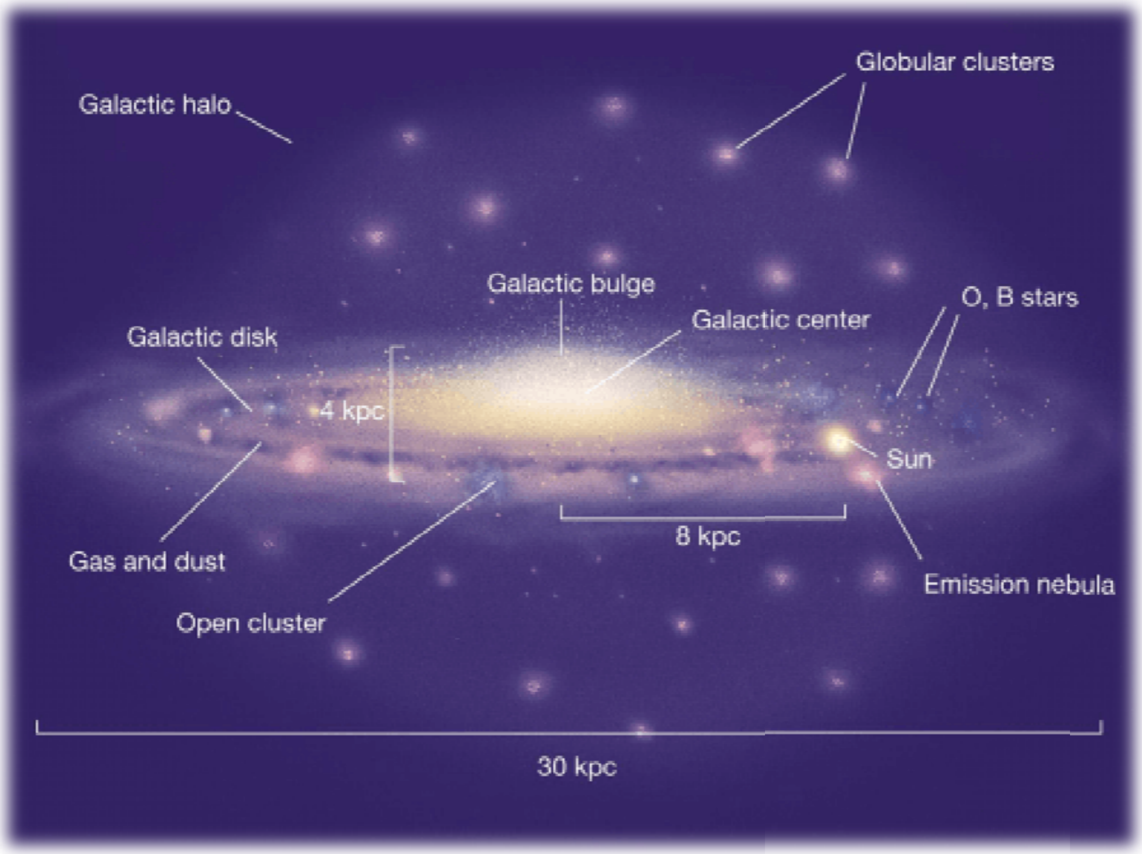

ছায়াপথ

রানা খান

প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ অবাক দৃষ্টিতে রাতের আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখেছে। চাঁদহীন অন্ধকার রাত্রে, শহরের আলোক-দূষণ থেকে দূরে কোথাও, চারধার খোলা কোন জায়গায় সন্ধ্যা থেকে মেঘমুক্ত আকাশের দিকে তাকালেই লক্ষ্য করবেন অগণিত, নানারকম ঔজ্জ্বল্যের তারার মেলা। কোথাও তাদের দেখা মেলে বেশি, কোথাও কম, কোনটা খুব ঝকমক করছে, কোনটাকে দেখতে বেশ কষ্ট করতে হচ্ছে। বছরের পর বছর বিভিন্ন দিনে ঠিক সময়ে এদের বারবার দেখা যায়, এটা সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ পর্যবেক্ষণ করেছে। তার ভিত্তিতে তাদের ঘিরে তৈরি হয়েছে কাল্পনিক সব চরিত্র। তারাদের কাল্পনিক রেখায় সংযুক্ত করে, সেই সব চরিত্রানুযায়ী মানুষ, পশু, যন্ত্র ইত্যাদির বিভিন্ন অবয়ব দেওয়া হয়েছে। এদের বলা হয় নক্ষত্র-মণ্ডল, যেমন কালপুরুষ, বৃশ্চিক, বীণা ইত্যাদি। ডিসেম্বর মাসে সন্ধ্যা ৭টায় পুব আকাশে কালপুরুষ মণ্ডলকে উদয় হতে দেখা যায় কিংবা জুলাই মাসের ভোর ৫টায় আবার তাকে পুব আকাশেই উঠতে দেখা যায়। এই ঘড়ির কোন নড়চড় নেই। পৃথিবীর বার্ষিক গতি ও আহ্নিক গতির বড়সড় হেরফের না হলে এর কোন গড়বড় হবে না।

বর্ষার শেষে ভোরে লেখকের তোলা কালপুরুষ, বড় কুকুর ও শশক তারামন্ডলের ছবি। পরের ছবিতে দাগ দিয়ে কল্পনাকে রূপায়িত করা হয়েছে। তৈরী হয়েছে Orion, Canis Major ও Lepus নক্ষত্রমণ্ডল।

ছবিটা দেখলেই বোঝা যাবে কিভাবে সভ্যতার ক্রমঃবিকাশ আকাশকে কাছে টেনে নিয়ে এসেছে। মনে মনে কত না ছবি মানুষ এঁকেছে এই তারাদের ঘিরে। কেননা এর মধ্যে দিয়ে সে শিখেছে দিন গুনতে, দিক ঠিক করতে আর ধর্মের ভীতির মধ্যে নিজেকে আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধতে। প্রকৃতির ঘড়ির উপর তার নির্ভরশীলতা যত বেড়েছিল, ততই সে আকাশ সম্পর্কে আরও বেশি জানতে আগ্রহী হয়েছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞান হয়ে উঠল অন্যতম প্রাচীন বিজ্ঞান। সারা আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা খালি চোখে দেখা যায় এমন তারার সংখ্যা মাত্র সাড়ে ছয় হাজারের কাছাকাছি। সেগুলোকে প্রথম তালিকাভুক্ত করেন হিপ্পার্কাস্, যদিও তাদের অবস্থান সম্পর্কে কোন ধারণা সে সময় ছিলো না। দূরবীনের ব্যবহার শুরু না হওয়া পর্যন্ত এইটুকুই জানতাম যে আমাদের থেকে তারারা অনেক দূরে আছে।

আকাশের বুক চিরে উত্তর থেকে দক্ষিণে নক্ষত্রদের মধ্যে দিয়ে একটা আবছা আলোর পট্টির অস্তিত্ব খেয়াল করলেই দেখা যায়। বর্ষার সময় বৃষ্টিস্নাত চাঁদহীন মেঘমুক্ত সন্ধ্যার আকাশে, বৃশ্চিক ও ধনু নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে ভাসমান পেঁজা তুলো বা আবছা সাদা মেঘের মত, খালি চোখে পরিষ্কার দেখা যায়। উত্তরে সেটি ঈগল, হংস পেরিয়ে ক্যাসিওপিয়া, পারসিয়ুস ঘুরে কালপুরুষের পাশ দিয়ে আবার দক্ষিণমুখী হয়। তখন তার চেহারা অনেক আবছা। নানান জায়গায় বিভিন্ন পরিসর, ঔজ্জ্বল্য নিয়ে রাতের আকাশকে এই ছায়াপথ আকর্ষণীয় করে তোলে।

প্রাচীনকালে ভারতীয়রা মনে করত এটি স্বর্গের সিঁড়ি। স্কান্ডানেভিয়ান উপজাতিদেরও একই অভিমত ছিল। মিশরীয়রা মনে করত ওটি বোধহয় স্বর্গের নীল নদ। গ্রীকদের কাছে এটি ছিল দেবী হেরার বুকের দুধের প্রবাহ, তার থেকেই হয়তো ইংরাজী নাম “মিল্কি ওয়ে” এসেছে। ভারতীয় পুরাণে একে বলা হয়েছে “আকাশ গঙ্গা”। এই গঙ্গাই স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

লেখকের তোলা ছায়াপথের ছবি, উজ্জ্বল নক্ষত্রটি শ্রবণা। কালো এলাকাগুলো গ্যাস ও ধুলো, সাদাটা তারায় ভরা।

গ্যালিলিও প্রথম দূরবীনের সাহায্যে লক্ষ্য করলেন আকাশগঙ্গা আসলে অসংখ্য নক্ষত্রের সমাহার। তারপর বিভিন্ন অনুসন্ধানে আমরা জেনেছি যে প্রায় ১০ হাজার কোটি নক্ষত্র, অসংখ্য গ্যাসপুঞ্জ আর বিশাল বিশাল আকারের অগুনতি ধূলোর মেঘ চাকতির আকারে আবর্তন করে চলেছে। এইভাবে সৃষ্ট নক্ষত্রের সমাহারকে “Galaxy” বা “তারাজগৎ” বা “নক্ষত্র-জগৎ” বলে। আমাদের এই নক্ষত্র-জগৎকে “ছায়াপথ নক্ষত্র-জগৎ” বা “Milky Way Galaxy” বলে। আমাদের মাথার উপরে চাকতিটির কেন্দ্র ও ধারের দিকে তারাদের অবস্থান অনেক বেশি বলে, সেদিকে তারাগুলোকে আলাদা করে দেখা যায় না। তাই সেটা অস্পষ্ট সাদা মেঘের মত দেখায়। সেই দৃশ্য থেকেই যত গল্পকথার উৎপত্তি।

আমাদের এই ছায়াপথ তারা-জগতের ১০ হাজার কোটি তারাদের সবাইকে তো আর দেখতে পাই না। গ্যাস ও ধুলোর আড়ালে কত যে লুকিয়ে আছে। চাকতির ব্যাস প্রায় ১ লক্ষ আলোক-বর্ষ। অর্থাৎ সেকেণ্ডে প্রায় ৩ লক্ষ কিলোমিটার বেগে ধাবমান আলো এই তারা-জগৎকে এপার ওপার করতে ১ লক্ষ বছর নেবে। আমাদের প্রাণদাতা সূর্য এই নক্ষত্র-জগতের কেন্দ্র থেকে ২৬ হাজার আলোকবর্ষ দূরে। তার সৌরজগতকে নিয়ে সেকেন্ডে ২৪০ কিলোমিটার বেগে সেই কেন্দ্রকে আবর্তন করে চলেছে। একটি পাক সম্পূর্ণ করতে সময় লাগবে সাড়ে ২২ কোটি বছর।

আমাদের গ্যালাক্সির চেহারা শিউলি ফুলের ছড়িয়ে থাকা পাপড়ির মতন। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, এই নক্ষত্রজগতের কেন্দ্রে আছে একটি বিশাল কৃষ্ণগহ্বর (Black hole) যার ভর প্রায় ৩০ লাখ সূর্যের ভরের সমান, ব্যাস মাত্র ২২ কোটি কিলোমিটার। শনির কক্ষপথের চেয়ে ছোট স্থানে এতটা ভরের অস্তিত্ব কৃষ্ণগহ্বরকেই সমর্থন করে।

এই কেন্দ্রের খুব কাছে একটি তীব্র রেডিয়ো-তরঙ্গের উৎস আছে যার নাম সাজিটারিয়াস এ (Sagittarius A)।

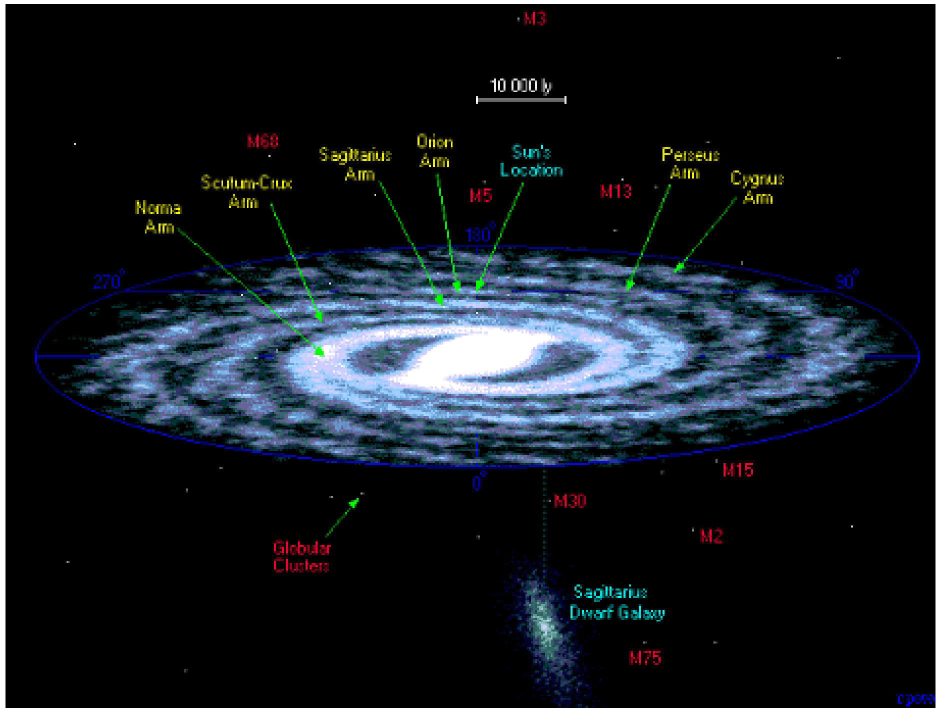

কেন্দ্রের চার ধারে তারায় ঠাসা ঘন অঞ্চলটিকে বলা হয় "স্ফীত অঞ্চল (Bulge)"। স্ফীত অঞ্চল থেকে পাপড়ির মত বেরিয়ে এসেছে বেশ কয়েকটি বাহু যেগুলি আবার কেন্দ্রকে কুণ্ডলিত চেহারায় ঘিরে ধরে আবর্তন করছে। এই অঞ্চলকে বলা হয় "চাকতি

লেখকের তোলা ছায়াপথের কেন্দ্র অঞ্চলের ছবি

(Disk)"। এই চাকতির মধ্যে বেশ কয়েকটি কুণ্ডলিত বাহু (Arm) আছে। কেন্দ্রের দিকে বাহুটি হচ্ছে "ধনু বাহু", তার পরের কুণ্ডলীটি "কালপুরুষ বাহু" আর এর পরেরটি "পার্সিয়ূস বাহু"। আমাদের সূর্য কালপুরুষ বাহুর একটি প্রশাখায় আছে। এছাড়া "নরমা বাহু" ও "স্কুটাম সেন্টরাস বাহু" উল্লেখযোগ্য কুণ্ডলিত শাখা।

ছায়াপথের চাকতির তল থেকে ওপরে ও নিচে কিছু বর্তুলাকার, গোলাকার বা বলায়াকার নক্ষত্রগুচ্ছ দেখতে পাওয়া যায়। ওই অঞ্চলগুলিকে ছায়াপথের "বর্ণবলয় (Halo)" বলা হয়। ওই অঞ্চলে প্রায় ২০০টি বিশালাকৃতি বর্তুলাকার নক্ষত্রগুচ্ছ আছে যাদের এক একটিতে গড়ে লক্ষাধিক সূর্যের মত ভরযুক্ত তারা আছে।

ছায়াপথ নক্ষত্রজগতে দুই ধরণের তারা দেখতে পাওয়া যায় যাদের ভিত্তিতে ছায়াপথের অঞ্চলগুলিকে বিভাজিত করা হয়েছে। এক, বয়সে নবীন “প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্র (Population I)”। নীল রঙের উজ্জ্বল এই তারাগুলোর মধ্যে ভারী মৌলগুলিকে পাওয়া যায়। এগুলির দেখা মেলে কুণ্ডলিত বাহুগুলোয়। দুই, “দ্বিতীয় শ্রেণীর নক্ষত্র (Population II)”। এরা বয়সে প্রবীণ এবং এদের মধ্যে ধাতব ভারী মৌলগুলি দেখা যায়না। লাল রঙয়ের এই তারাগুলোকে দেখা যায় বর্ণ-মণ্ডলের বর্তুলাকার নক্ষত্রগুচ্ছগুলিতে।

এই বর্তুলাকার নক্ষত্রগুচ্ছগুলি ছায়াপথ নক্ষত্র-জগতের কেন্দ্রকে অতি উপবৃত্তাকার কক্ষপথে আবর্তন করছে। দৃশ্যমান নক্ষত্রগুলির আবর্তন বেগ মেপে দেখা গেছে যে এদের দূরত্বের সাথে বেগের সম্পর্ক সৌরজগতের মত নয়। অর্থাৎ শুধুমাত্র কেন্দ্রের বিশাল ভরের মহাকর্ষ বলের জন্য সেগুলি আবর্তিত হলে যে বেগ তাদের হত এখানে তা হচ্ছেনা। দূরবর্তী বস্তুগুলোর বেগ তার চেয়ে বেশী। সেজন্য ধারণা হল আমাদের তারা-জগতে প্রচুর “অদৃশ্য বস্তু (Dark matter)” আছে, যাদের আকর্ষণে বস্তুগুলোর আবর্তন বেগ বেড়ে যাচ্ছে। আর সেই অদৃশ্য বস্তু পরিমাণ অনেক বেশী। নক্ষত্র-জগতগুলোয় শতকরা ৯০ ভাগ অদৃশ্য বস্তু ও বাকী ১০ ভাগ দৃশ্য বস্তু।

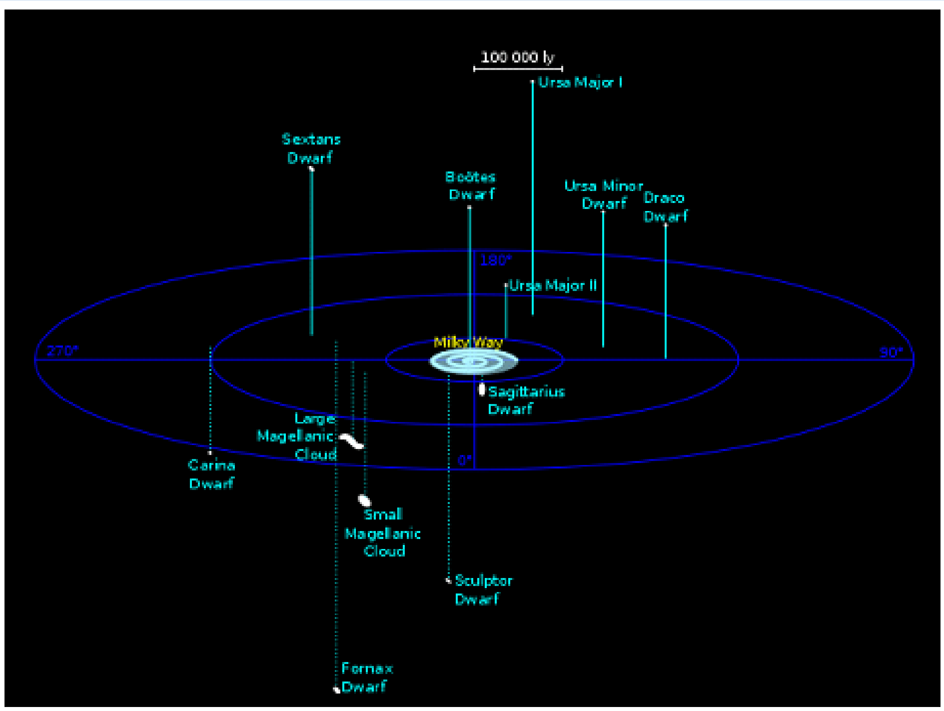

এই মহাবিশ্বে লক্ষ লক্ষ লক্ষ ... কোটি তারাজগত আছে। আদের মধ্যে আবার ছোট বড় দলাদলি আছে। আমাদের ছায়াপথের নিকটবর্তী “বৃহৎ মাজেলানিক মেঘ (Large Magelanic Cloud)”, “ছোট মাজেলানিক মেঘ (Small Magelanic Cloud)”, (এই দুটি নক্ষত্র-জগতকে দক্ষিণ গোলার্ধে খালি চোখে রাতের আকাশে দেখা যায়), “ধনুরাশির বামন উপবৃত্তাকার তারা-জগত (Sagittarius Dwarf Eliptical Galaxy)”, “বড় কুকুর মণ্ডলের বামন তারা-জগত (Canis Major Dwarf Galaxy)”, “অতি ঘন বামন তারা-জগত (Ultra Compact Dwarf Galaxy)” ইত্যাদি নক্ষত্র-জগতদের নিয়ে একটা পাড়া তৈরি করেছে।

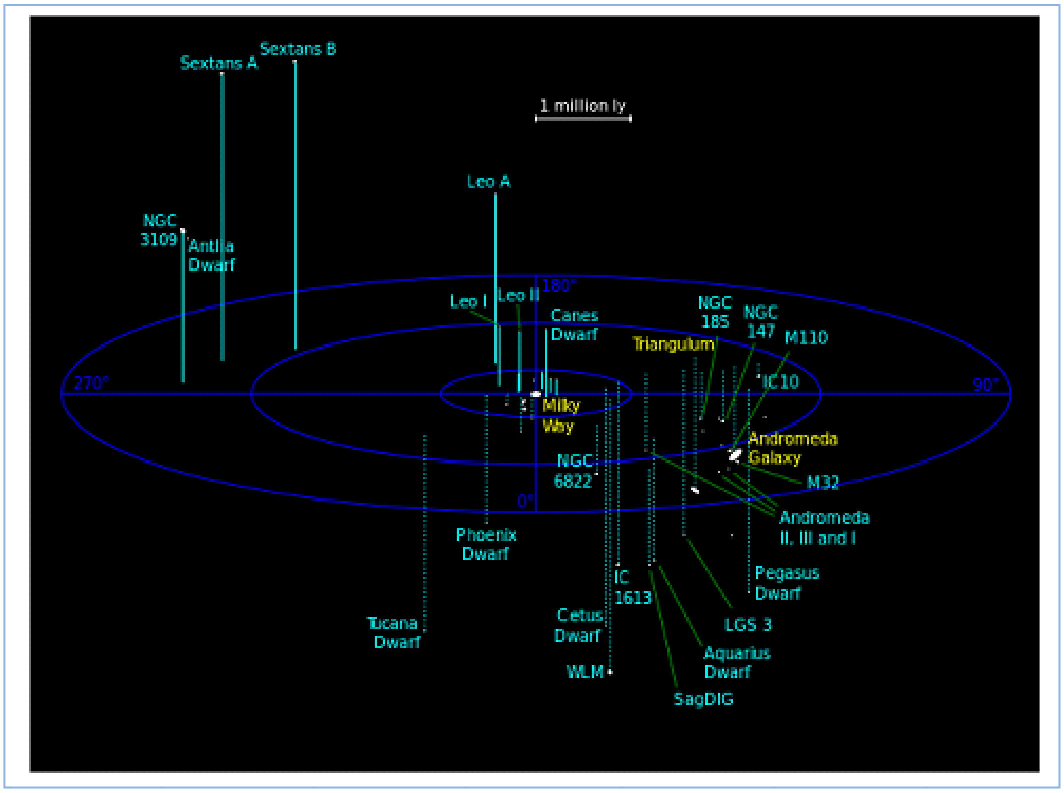

এই পাড়া আবার "অ্যাণ্ড্রোমিডা তারা-জগত (M31 নামে সুপরিচিত, Andromeda Galaxy)" ও "ট্র্যাঙ্গুলাম তারা-জগত (M 33 নামে পরিচিত, Triangulam Galaxy)" মিলে "আঞ্চলিক গোষ্ঠী (Local Group)" তৈরি করেছে। এই গোষ্ঠীর অনান্য সদস্যরা হল NGC 6822, NGC 205, NGC 147, IC 1613 ইত্যাদি।

শরৎকালে সন্ধ্যাবেলায় বা গরমকালে ভোরবেলায় চাঁদহীন আকাশে অন্তত একবার ছায়াপথের মুখোমুখি হওয়া প্রত্যেকের দরকার। আকাশের সৌন্দর্য্য আর নিজেদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে তবেই ওয়াকিবহাল হওয়া যায়।

লেখক পরিচিতি ('বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত হওয়ার সময়):

লেখক বিধাননগর রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয়-এর পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন http://bigyan.org.in/2015/04/11/milky-way/

কিছু তথ্য উইকিপিডিয়া থেকে সংগৃহীত। লেখকের তোলা ছবি ছাড়া বাকি ছবির সূত্র:

www.atlasoftheuniverse.com
www2.astro.psu.edu
www.jms7.com
www.astronoo.com

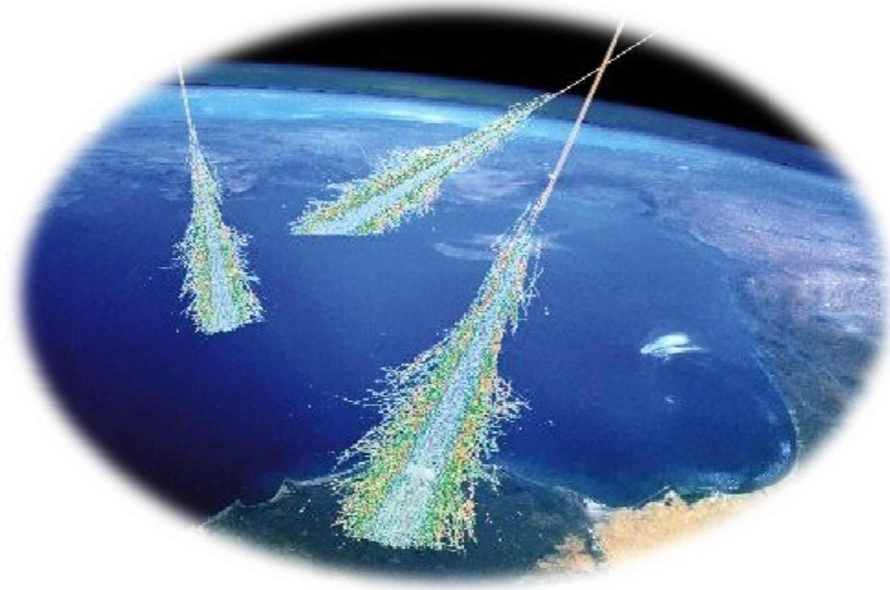

ভিক্টর হেস ও মহাজাগতিক রশ্মি

জয়দীপ মিত্র

রবিঠাকুর লিখেছিলেন “আলোকের এই ঝরনা ধারায় ধুইয়ে দাও” - আলোকের ঝরনা ধারাই বটে, কিন্তু সে ঝরনা শুধু সূর্যালোকস্নাত তা নয়, সে ঝরনা-রশ্মির আগমন অনন্ত, অসীম মহাজগৎ থেকে - নাম তাই মহাজাগতিক রশ্মি (cosmic ray)। অবিরাম ধারাস্রোতের মতো তা ঝরে পড়ছে পৃথিবীপৃষ্ঠে - প্রতিমুহূর্তে কোটি কোটি কণা ভেদ করে যাচ্ছে আমাদের শরীর - প্রায় সম্পূর্ণটাই আমাদের অগোচরে। এই রশ্মির সঙ্গে বাতাসের কণাগুলির আন্তঃক্রিয়ায় কণাগুলির আয়নন (ionization) ঘটে। তৈরি হয় আয়নিত কণার স্রোত। প্রথম থেকেই কি জানা ছিল এই কথা? নিশ্চয়ই নয়। বাতাসের কণার আয়ননের সাথে বিজ্ঞানীরা পরিচিত থাকলেও ১৯১১ - ১২ সাল পর্যন্ত তার মূল কারণ ছিল অধরা। ১৯১২ সালে বিজ্ঞানী ভিক্টর ফ্রানজ হেস (Victor Franz Hess) পরীক্ষামূলক ভাবে প্রমাণ করলেন -এই আয়ননের মূল কারণ মহাজগৎ থেকে আসা অজানা রশ্মিস্রোত। ২০১২ সালে তাই পালিত হয়ে গেল মহাজাগতিক রশ্মি আবিষ্কারের শতবর্ষ। অদ্ভুতভাবে দেখেছি, আমাদের মতো বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের কাছে হেস বড়ই অচেনা। সে প্রসঙ্গে কিছু আলোকপাত করার জন্যই এ লেখার অবতারণা।

ভিক্টর হেস (Victor Hess) জন্মেছিলেন অস্ট্রিয়ায়- ২৪শে জুন, ১৮৮৩ সালে। বাবা ভিনজেন হেস ছিলেন রাজা Oettingen Wallerstein - এর এস্টেটের মুখ্য বনপাল। মা সারাফিন হেস (Sarafine Hess)। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ভিক্টর যোগ দিলেন গ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। সালটা ১৯০১। ১৯০৬ সালে পি.এইচ.ডি. সমাপ্ত করার পর ভিক্টর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে post doctorate করার জন্য

তখনকার বিখ্যাত পদার্থবিদ পল ড্রুড -এর কাছে

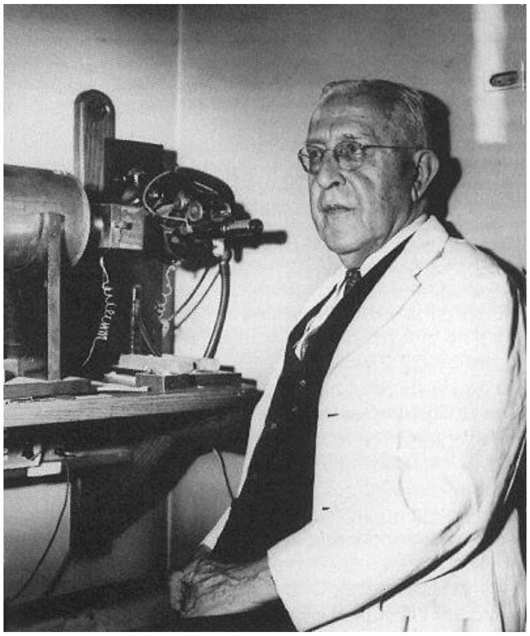

ভিক্টর হেস

আবেদন করলেন। ড্রুড সে সময় কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়ে তাপ ও তড়িত-পরিবাহিতা নিয়ে বিখ্যাত সব কাজ করছেন। (বলে রাখা ভালো, আলোর গতিবেগের চিহ্ন হিসেবে আমরা যে সংকেত c ব্যবহার করি, তা ড্রুড-এরই দেওয়া)। সঙ্গে আলোকের বিভিন্ন ধর্ম নিয়েও গবেষণা করছেন। ভিক্টর চেয়েছিলেন ড্রুড-এর কাছে আলো নিয়ে গবেষণা করতে। কিন্তু অদৃষ্টের কি পরিহাস! ভিক্টর বার্লিন পৌছানোর কিছু সপ্তাহ আগেই ড্রুড আত্মহত্যা করলেন। এরপর ফ্রাঞ্জ এক্সনার ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাকে গবেষণার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। সে সময় ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগৎজোড়া নাম, পদার্থবিদ্যা বিভাগে রয়েছেন – এক্সনার, বিকিরণ সংক্রান্ত গবেষণায় তাঁর খ্যাতি তখন সর্বত্র। ১৯০৭ সালে বোল্টজ্‌মান-এর স্থানে যোগ দিয়েছেন ফ্রেড্রিক হয়াসেনোর্হল (Friedrich Hasenohrl) (১৮৭৪-১৯১৫)। হ্যাসেনোর্হল সে সময় গবেষণা করছেন তড়িৎ চুম্বকীয় ভর নিয়ে। প্রসঙ্গত বলে রাখি, হয়াসেনোর্হল-এর কাছে সে সময় গবেষণা করছেন এরউইন স্রোডিংগার (পরবর্তীকালে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অন্যতম আবিষ্কারক হিসেবে তাঁর নাম চিহ্নিত হয়ে থাকবে)। ১৯১৫ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গ্রেনেডের আঘাতে হ্যাসেনোর্হল মারা যান। যা হোক, হয়াসেনোর্হল বা এক্সনার এর সাথে কাজ করতে এসে বিকিরণের গতি-প্রকৃতি সংক্রান্ত গবেষণায় হেসও উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। পরে অধ্যাপক ভিক্টর মেয়ার এর তত্ত্বাবধানে "ইনস্টিটিউট অফ্ রেডিয়াম রিসার্চ" - এ কাজ করতে আসেন । এখানে থাকাকালীন ভিক্টর মহাজাগতিক রশ্মি সংক্রান্ত বিখ্যাত গবেষণাগুলি করেন।

অনেকটা সময় পিছনে চলে যাওয়া যাক। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবিষ্কৃত হয়েছিল তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্র। ১৭৮৫ সালে পরীক্ষা করতে গিয়ে চার্লস-অগাস্টিন-দ্য-কুলম্ব (বিজ্ঞানের ছাত্ররা সবাই কুলম্বের সূত্রের সাথে পরিচিত) লক্ষ্য করেছিলেন কোন তড়িতাহিত ধাতব গোলককে বাতাসে রেখে দিলে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তড়িৎক্ষরণ হয় এবং গোলকটি নিস্তড়িত হয়ে পড়ে। তার আগে অনেকের ধারণা ছিল বাতাস তড়িতের কুপরিবাহী। কুলম্ব দেখালেন তা ঠিক নয়। তড়িৎবীক্ষণের ক্ষেত্রেও দেখা গেল একই ঘটনা। পরবর্তীকালে মাইকেল ফ্যারাডে আরো ভালোভাবে কুলম্বের ধারণার যথার্থতা প্রমাণ করলেন। যত দিন যাচ্ছিল, তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রের প্রভূত উন্নতিসাধন হচ্ছিল। প্রথিতযশা বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন, ক্রুকস্‌-রা পরীক্ষা নিরীক্ষার সুবিধার্থে তড়িৎবীক্ষণের সংস্কার করছিলেন। ১৮৭৯ সালে ক্রুকস্ লক্ষ্য করলেন তড়িৎবীক্ষণের ভিতরে বাতাসের চাপ কমালে তড়িৎক্ষরণ ঘটে ধীর গতিতে। মোটামুটি ভাবে

বোঝা গিয়েছিল এইসব তড়িৎক্ষরণের মূলে রয়েছে তড়িৎবীক্ষণের ভিতরের বাতাসের কণাগুলির আয়নন (যদিও পরে দেখা গেল এই ধারণাও ঠিক নয়)। কিন্তু বাতাসের কণাগুলির আয়নিত হওয়ার কারণ সম্পর্কে কোন ধারণা সে সময় ছিল না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে জোরকদমে কানাডা, ইটালি, আমেরিকা এবং বিশেষতঃ অস্ট্রিয়ায় বাতাসের তড়িৎ পরিবাহিতা নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা আরম্ভ হয়। আগে বলেছি এক্সনার-এর কথা। তিনিও এ বিষয়ে গবেষণা করছিলেন ছাত্র স্রোডিংগার-এর সাথে । পরবর্তী জীবনে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় গবেষণা করলেও স্রোডিংগার সে সময়ে বাতাসের তড়িৎ পরিবাহিতা নিয়ে গবেষণা করছিলেন। ১৯১০ সালে তিনি ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। লক্ষ্যণীয়, স্রোডিংগার-এর পি.এইচ.ডি. থিসিসের নাম ছিল "On the conduction of electricity on the surface of insulators in moist air" (কোয়ান্টাম বলবিদ্যার কোন নামগন্ধ নেই!)।

১৮৯৫ সালে বিজ্ঞানী থমসন আবিষ্কার করলেন এক্স-রে। ১৮৯৬ সালে বিজ্ঞানী বেকেরেল আবিষ্কার করলেন ইউরেনিয়াম মৌলের স্বতঃস্ফূর্ত তেজস্ক্রিয়তা ধর্ম। কিছুদিন পরেই পিয়ের ও মেরী কুরী পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম মৌলেও তেজস্ক্রিয়তার সন্ধান পেলেন। তেজস্ক্রিয়তার কারণে মৌলগুলি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে রশ্মি বিকিরণ করে। দেখা গেল তেজস্ক্রিয় মৌলের উপস্থিতিতে তড়িৎবীক্ষণের পাতদুটি দ্রুত তড়িৎক্ষরণ করে। সুতরাং একদল বিজ্ঞানী ধারনা করলেন, পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে বিপুল তেজস্ক্রিয় মৌলের ভান্ডার রয়েছে, তা থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সাথে বাতাসের কণাগুলির আন্তঃক্রিয়ার ফলে ঘটছে আয়োনাইজেশন বা আয়নন। কিন্তু এলসার, গাইটেল, উইলসন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা তাদের পরীক্ষায় যে ফল পেলেন, তার ব্যাখ্যা তেজস্ক্রিয়তা দিয়ে সম্পূর্ণ ভাবে করা গেল না। প্রশ্ন উঠল, হয়তো এই আয়নন-এর কারণ তেজস্ক্রিয়তা নয়, মহাজগৎ থেকে আসা কোন রশ্মি। ১৯০১ সালে উইলসন লিখলেন –

বাতাসে থাকা এই আয়নের উৎস নিয়ে আমাদেরকে আরো বেশি করে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে হবে। হয়ত এই আয়নের উৎস বর্হিজগৎ থেকে আসা কোন রশ্মি, যা হয়তো ক্যাথোড রশ্মি, কিন্তু আরো বেশি ভেদন ক্ষমতা সম্পন্ন।

এমন কি, তৎকালীন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার ও পদার্থবিদ নিকোলা টেসলা ১৯০১ সালে আমেরিকায় একটি পাওয়ার জেনারেটর-এর পেটেন্ট নিয়েছিলেন। কারণ হিসেবে তার বক্তব্য ছিল –

সূর্য বা অন্য কোন মহাজাগতিক বস্তু থেকে প্রতি মুহূর্তে যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুকণা চলে আসছে সেগুলোর কারণেই ঘটছে বাতাসের কণার তড়িতাহিতকরণ।

১৯০৯ সাল পর্যন্ত যে সব পরীক্ষা হয়েছিল, তা থেকে বোঝা গিয়েছিল এই অজানা রশ্মির ভেদন ক্ষমতা (penetrating power) অত্যন্ত বেশী এবং পরীক্ষা ব্যবস্থায় যত অন্তরণ (insulation) ই থাকুক না কেন, এ রশ্মির প্রভাব সর্বত্র। বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারছিলেন এই অজানা রশ্মির স্বরূপ নির্ধারণ করতে গেলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হবে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে উঁচুতে। কারণ উঁচুতে ওঠার সাথে পৃথিবীর তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব কমে আসবে। পরীক্ষাগারের পরীক্ষায় এই রশ্মির স্বরূপ নির্ধারণ সম্ভবপর নয়।

এরপর আসা যাক জার্মান পাদরী থিয়োডোর উলফ(Theodor Wulf)-এর কথায়। উলফ ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানী। ২০ বছর বয়সে তিনি পাদরী হয়ে যান। অবশ্য এতে উলফ-এর পড়াশোনা থেমে থাকেনি। গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়াল্টার নার্নস্ট(Walther Nernst)-এর কাছে পদার্থবিদ্যা পড়েছিলেন তিনি। অজানা রশ্মির স্বরূপ উদঘাটনের জন্য আরো সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করার জন্য উলফ তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রের বেশ কিছু পরিবর্তন করলেন। সোনার পাত দুটোর স্থানে লাগালেন ধাতব কাঁচ (metalised glass)। ১৯০৯ সালে জার্মানি, হল্যান্ড ও বেলজিয়ামের বিভিন্ন স্থানে তিনি পরীক্ষা চালালেন তার যন্ত্র নিয়ে। উলফ-এরও ধারনা ছিল অজানা রশ্মির কারণ মৌলের তেজস্ক্রিয়তা। এরপর ১৯০৯ ও ১৯১০ সালে উলফ গেলেন প্যারিসে-আইফেল টাওয়ারের (উচ্চতা ৩০০ মিটার) মাথায় উঠে পরীক্ষা করলেন। কিন্তু ৩০০ মিটার উঁচুতে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ যতটা কমার কথা ছিল পরীক্ষা থেকে তা পাওয়া গেল না।

উলফ লিখলেন –

বিকিরণের তীব্রতা ৩০০ মিটার উচ্চতায় গেলেও মাটিতে পাওয়া লব্ধমানের অর্ধেক ও নয়।

যদিও উলফ –এর নেওয়া মান বহুদিন ধরে অন্যতম প্রামাণ্য পরীক্ষালব্ধ মান হিসেবে সমগ্র ইউরোপে চালু ছিল। উলফ-এর এসব পরীক্ষার অনুসন্ধান আরো জোরদার হিসেবে চালানোর জন্য বিজ্ঞানীরা আশ্রয় নিলেন বেলুন-পরীক্ষার। অজানা রশ্মির উৎস সন্ধানে ১৯০৯ সালে প্রথম বেলুনে চড়ে আকাশে গেলেন কার্ল বার্গউইট্‌জ (Karl Bergwitz)। এর আগে অবশ্য ফ্রাঞ্জ লিন্‌কে (Franz Linke)-এর কথা জানা যায় যিনি ১৯০০ থেকে ১৯০৩ বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করার সময় ১২ বার বেলুনে চড়ে আকাশে উড়েছিলেন। সঙ্গে ছিল এলসার এবং গাইটেল এর তৈরি তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্র। কিন্তু আশানুরূপ কোনো ফল লিন্‌কে বা বার্গউইট্‌জ কারুর অভিযানেই পাওয়া যায় নি। বেলুনে চড়ে আকাশে গিয়ে এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন অ্যালবার্ট গোকেল (Albert Gockel)। গোকেল ছিলেন ফ্রিবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। বার্গউইট্‌জ-এর অভিযানের কয়েক মাসের মধ্যেই গোকেল বেলুনে চড়েছিলেন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪৫০০ মিটার পর্যন্ত উপরে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি।

ভিক্টর হেস (মাঝখানে) ভিয়েনা থেকে বেলুনে ওড়ার সময় (১৯১১)।

তিন-তিনবার বেলুনে চড়ে আকাশে যান এবং ৩০০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অজানা রশ্মির খোঁজ চালান তিনি। গোকেল লক্ষ্য করেছিলেন উচ্চতা বাড়ার সাথে আয়ননের মাত্রার কোন হ্রাস ঘটে না। ১৯১০ সালে গোকেল লিখেছিলেন –

অত্যধিক ভেদন ক্ষমতা সম্পন্ন অজানা এই রশ্মির উৎস হয়তো পৃথিবীপৃষ্ঠের উপরিভাগে থাকা তেজস্ক্রিয় মৌল নয়।

সত্যি কথা বলতে কি, গোকেল এর কপাল ছিল মন্দ। স্রোডিংগার তাঁর পি.এইচ.ডি. গবেষণায় দেখিয়েছিলেন যদি তেজস্ক্রিয়তার কিছু অংশ পৃথিবী থেকে আর কিছু অংশ মহাজগৎ থেকে আসে, তবে ৩০০০ মিটার পর্যন্ত পৃথিবী থেকে প্রাপ্ত তেজস্ক্রিয় বিকিরণ মহাজগৎ থেকে আসা তেজস্ক্রিয় বিকিরণকে প্রশমিত করে দেয়। গোকেল সাহেব যদি আরো কিছুটা উপরে উঠতেন , তাহলে তিনিই হয়তো মহাজাগতিক রশ্মি আবিষ্কারের পুরোধা হতে পারতেন। যা হোক , কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতলেন হেস। অনেকে মনে করেন, হেস যেহেতু স্রোডিংগারের সাথে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজ করতেন, হেস স্রোডিংগারের গণনার সাথে পরিচিত ছিলেন। হেস জানতেন যে গোকেল এর পরীক্ষায় কিছু গণ্ডগোলের কারণ ছিল গোকেল এর যন্ত্রে উচ্চতার সাথে চাপের তারতম্য হতো বেশ। ফলে গণনায় ভুল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। হেস চাপ নিরোধক ionization chamber তৈরি করলেন। গোকেল এর মতো হেসও ছিলেন পাকা বেলুন-উড়িয়ে। ১৯১১ থেকে ১৯১২ এই এক বছরে হেস বেলুনে উড়েছিলেন মোট দশবার। ১৯১১ সালে তিনবার আর ১৯১২ সালে সাতবার। ১৯১১ সালে প্রথমবার ১০৭০ মিটার পর্যন্ত উঠেছিলেন তিনি। পরীক্ষায় দেখলেন উচ্চতার সাথে আয়নন এর যে খুব একটা তারতম্য হচ্ছে তা নয়। ১৯১১ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধে হেস লিখলেন –

উচ্চতার সাথে সাথে বিকিরণের তীব্রতা যেহেতু সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে আসা বিকিরণের চেয়ে খুব আলাদা নয়, সুতরাং পৃথিবীর অভ্যন্তরের তেজস্ক্রিয় মৌলের থেকে বিকিরণের সাথে নিশ্চয়ই অন্য কোন বিকিরণের ও উৎস হিসাবে কাজ করা কিছু অস্বাভাবিক নয়।

১৯১২ সালে যে সাতবার বেলুনে চড়েছিলেন হেস, তার মধ্যে দুটো উড়ান ছিল খুব উল্লেখযোগ্য। অনেকে প্রশ্ন তুলেছিলেন এই রশ্মির উৎস হয়তো সূর্য। পরীক্ষার জন্য হেস বেছে নিলেন ১৯১২ সালের ১৭ই এপ্রিল কে। ওইদিন ছিল পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ। হেস ২৭৫০ মিটার উচ্চতায় উঠলেন। সূর্যগ্রহণ সত্ত্বেও হেস দেখলেন ২০০০ মিটার উচ্চতায় ও আয়ননের তীব্রতা পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে বেশী। এর থেকে হেস সিদ্ধান্তে এলেন এই রশ্মির কারণ সূর্য নয়। এই বছরই সাত নম্বর বেলুন যাত্রায় হাইড্রোজেন ভর্তি বেলুনে চেপে ৭ই আগস্ট ৫৩৫০ মিটার উচ্চতায় উঠলেন তিনি। অস্ট্রিয়ার এক শহর Aussig থেকে সকাল ৬টা ১২ মিনিটে উড়েছিল সেই বেলুন। প্রায় ৫ ঘণ্টা পর সে বেলুন দুপুরে এসে নেমেছিল জার্মানির শহর Pieskow (বার্লিন থেকে ৫০ কিমি পূর্বে)। এ সমস্ত পরীক্ষার ফলাফল পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পর্যালোচনার পর হেস তার বিখ্যাত সিদ্ধান্তে এলেন - বাতাসের কণাগুলির আয়ননের মূলে রয়েছে মহাজগৎ থেকে আসা রশ্মিস্রোত। এই রশ্মির আগমন সূর্য থেকে আরো বহুদূরে থাকা অনন্ত, অসীম মহাবিশ্ব থেকে। ১৯১২ সালে Physikalische Zeitschrift পত্রিকায় হেস – এর বিখ্যাত প্রবন্ধ প্রকাশিত হল - "Observations in low level radiation during seven free

balloon flights”. পরীক্ষালব্ধ ফলাফল ব্যাখ্যা করে হেস তাঁর প্রবন্ধে লিখলেন-

১) মাটি থেকে কিছুটা উপরে বিকিরণের তীব্রতা কমার পরিমাণ খুব সামান্য।

২) ১০০০ থেকে ২০০০ মিটার উচ্চতায় বিকিরণের তীব্রতার বৃদ্ধি বেশ লক্ষ্য করার মতো।

৩) ৩০০০ থেকে ৪০০০ মিটার উচ্চতায় বিকিরণের তীব্রতা মাটিতে পাওয়া বিকিরণের তীব্রতার চাইতে ৫০% বেশী।

৪) ৪০০০ থেকে ৫২০০ মিটার উচ্চতায় বিকিরণের তীব্রতা মাটিতে পাওয়া বিকিরণের তীব্রতার প্রায় ১০০ গুণ।

নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হল মহাজাগতিক রশ্মির অস্তিত্ব। হেস লিখলেন -

উপরের পর্যবেক্ষণ থেকে এই সিদ্ধান্তে নিশ্চিত ভাবে উপনীত হওয়া যায় যে এই অত্যধিক ভেদন ক্ষমতা সম্পন্ন রশ্মির আগমন বর্হিবিশ্ব থেকে।

হেস আরো লিখলেন –

যেহেতু সূর্যগ্রহণের সময়ও আমি পরীক্ষা চালিয়েও বিকিরণের তীব্রতার কোন হেরফের লক্ষ্য করিনি, সুতরাং এই অজানা রশ্মির উৎস নিশ্চয়ই সূর্য নয়।

এরপর অবশ্য বিভিন্ন পরীক্ষায় মহাজাগতিক রশ্মির অস্তিত্ব সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। ১৯২০ সালে হেস গ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন । ১৯২১ সালে হেস বছর দুয়েকের জন্য আমেরিকা যান। পরবর্তীকালে ১৯৩১ সালে ইন্সব্রুক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে Hafelekar পাহাড়ের মাথায় (উচ্চতা ২৩০০ মিটার) মহাজাগতিক রশ্মি পর্যবেক্ষন এবং গবেষণার জন্য একটি গবেষণাগার তৈরি করেছিলেন। ১৯৩৭ সালে হেস যখন নিজের শহর গ্রাজে ফিরলেন, তখন জার্মানিতে একচ্ছত্র অধিপতি হিটলার। ইহুদী নিধন যজ্ঞে মেতে উঠেছেন তিনি। হেস এর স্ত্রী ছিলেন জাতে ইহুদী। সুতরাং কোপ পড়লো তাদের উপরেও। হেস এর চাকরি গেল। ভাগ্য ভালো, একজন সহানুভূতিশীল গেস্টাপো অফিসারের থেকে হেস জানতে পারলেন তারা অস্ট্রিয়ায় থাকলে কিছুদিনের মধ্যে গ্রেপ্তার হবেন। তাদের চালান করে দেওয়া হবে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। সুতরাং গ্রেপ্তারের প্রায় এক মাস আগেই হেস ও তার পরিবার পালালেন সুইজারল্যান্ডে। ১৯৩৮ সালে আমেরিকার ফোর্ড হ্যাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রণ আসে হেস এর কাছে। হেস আমেরিকা পাড়ি দিলেন। পরবর্তী জীবনটা হেস কাটিয়েছেন আমেরিকায়। ১৯৪৪ সালে তিনি আমেরিকার নাগরিক হন। চল্লিশের ও পঞ্চাশের দশকে মানব শরীরে রেডিয়ামের প্রভাব নিয়ে বহু মূল্যবান গবেষণা করেছিলেন তিনি। ১৯৬৪ সালের ৭ই ডিসেম্বর হেস মারা যান।

১৯৩৬ সালে মহাজাগতিক রশ্মি আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছিলেন তিনি। তাঁর সাথে সে বছর পদার্থবিদ্যায় পুরষ্কার পেয়েছিলেন পজিট্রন কণার আবিষ্কারক অ্যান্ডারসন। যে সমস্ত বিজ্ঞানী হেসের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিখ্যাত পদার্থবিদ আর্থার কম্পটন। নোবেল কমিটি কে পাঠানো রিপোর্টে কম্পটন লিখেছিলেন –

আমার মনে হয় সেই সময় হয়তো এসে গেছে যখন এই অসীম মহাজগৎ থেকে আসা রশ্মিকে আমরা প্রকৃত অর্থেই মহাজাগতিক বলতে পারি এবং এই রশ্মিকে যথার্থ ব্যবহার আমাদের কাছে নতুন নতুন

আবিষ্কারের দিগন্ত খুলে দিয়েছে, সুতরাং এই মহাজাগতিক রশ্মির আবিষ্কারকে আমরা একটি প্রথম শ্রেণীর আবিষ্কার হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি... আমার মনে হয়, হেস-ই হলেন প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি উচ্চতার সাথে বিকিরণের তীব্রতার আধিক্য সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করেছেন এবং আমার মতে হেস-ই হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রমাণ করেন বাতাসের কণাগুলোর আয়ননের উৎস মহাজগৎ।

হেস এর প্রতি সম্মানার্থে ২০০৪ সালে নামিবিয়ায় মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে গবেষনার জন্য তৈরি হয়েছে এক মানমন্দির (observatory) নাম দেওয়া হয়েছে HESS: High Energy Stereoscopic System।

লেখক পরিচিতি ('বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত হওয়ার সময়):

লেখক স্কটিশচার্চ কলেজ, কলকাতা - এর সঙ্গে যুক্ত।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন http://bigyan.org.in/2014/04/13/victor-hess-and-cosmic-ray/

ভিক্টর হেসের ছবির উৎস :

প্রথম ছবি:
http://physik.uibk.ac.at/hephy/Hess/more/victorhess.html

দ্বিতীয় ছবি:
http://www.nytimes.com/2012/08/07/science/space/when-victor-hess-discovered-cosmic-rays-in-a-hydrogen-balloon.html

প্রচ্ছদের ছবিটির উৎস: NASA

রাত্রির অন্ধকারে নর্দমার দুর্গন্ধের উৎস

সব্যসাচী সরকার

আমরা রোজকার সাধারণ ঘটনার আড়ালে বিজ্ঞানটা কিভাবে বোঝার চেষ্টা করি? হয় বয়োজ্যেষ্ঠদের জিজ্ঞাসা করে কিম্বা বিজ্ঞানের বইপত্তর ঘেঁটে। আজ এমন একটা ঘটনা বলবো যেটা আমরা সবাই হয়ত দেখেছি কিন্তু তার কারণ খুঁজে বার করা সহজ নয়। কি কারণে সূর্যের আলো না থাকলে নর্দমা থেকে দুর্গন্ধ বের হয়।

চায়ের দোকানের টিউব ওয়েলের নিত্য ব্যবহারে যে নর্দমাটা তৈরী হয় (চিত্র-a), ভোরে বা সন্ধ্যায় সেটা থেকে পচা ডিমের মত দুর্গন্ধ বেরোতে থাকে। সূর্যের আলোতে এই দুর্গন্ধ কমে যায় আর মাঝ দুপুরে কর্পূরের মত উবে যায়। রাতের সময়ে আবার এই দুর্গন্ধের প্রকোপ বেশী হতে থাকে। বাদলা দিনে সূর্যের আলো না থাকার ফলে এই দুর্গন্ধ বন্ধ হয় না। নর্দমাতে পচনশীল জৈবিক পদার্থগুলিই কি এই দুর্গন্ধের উৎস? আর তাদের সঙ্গে দিনের আলো

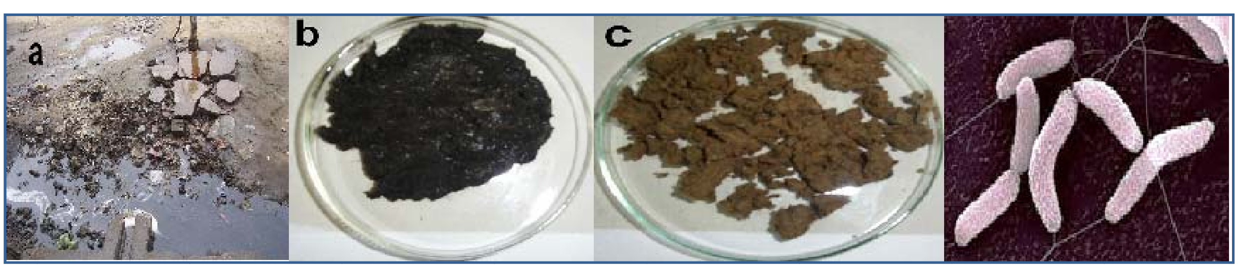

আর রাতের আধাঁরের সম্পর্ক কি?

আর একটা কথা – সেদিন নর্দমাটা পরিষ্কার করার সময় তার ভিতরের কালো পচা মাটি তুলে নিয়ে নর্দমাটার পাড়ে ফেলা হচ্ছিলো (চিত্র-b)। স্কুলে যাবার সময় লম্বা করে এই কালো পচা মাটির স্তুপ নর্দমাটার পাড়ে পড়ে থাকতে দেখলাম। কিন্তু পরদিন স্কুল যাবার সময় দেখলাম যে কালো মাটির একেবারে উপরের অংশটা গাঢ় বাদামী হয়ে গেছে (চিত্র-c)। অনেকটা কালো পাহাড়ের চূড়ার বরফ বিকেলের সূর্যের আলো পড়লে যেমন লাগে, সেরকম গেরুয়া মাটির মত দেখতে। দিন কয়েক পরে দেখলাম যে পাড়ে তোলা কালো মাটি আমাদের খেলার মাঠের বাদামী রঙের মাটির মতন হয়ে গেছে।

এরকম কেন হয় তা জানতে গেলে আমাদের পৃথিবীর প্রথম জীবনের উৎসের সন্ধানে যেতে হবে। খুব পেছনে না গিয়ে বলি, আজ থেকে মাত্র ৫৭ কোটি বছর আগে পৃথিবীর আবহাওয়া আজকের তুলনায় একেবারেই অন্যরকম ছিলো। পৃথিবীতে গাছপালা না থাকায় বাতাসে অক্সিজেনও ছিলো না। লাল রক্ত যুক্ত আমাদের মতো কোনো প্রাণীর অস্তিত্বও ছিল না (হ্যাঁ, নীলচে সবুজ রঙের রক্ত নিয়েও জীবন আছে)।

অক্সিজেন না থাকার ফলে আগের সেই জীবাণুগুলি খাবার থেকে শক্তি আহরণের সময় তৈরী হওয়া ইলেকট্রনগুলি সালফেট জাতীয় যৌগের ভিতরে পাচার করে দিতো।

যেসব জীবাণু তখন তৈরী হয়েছিলো, তারা মুক্ত অক্সিজেন না পেয়ে শক্তি সংগ্রহের জন্য অকার্বনিক (non-carbonic) যৌগগুলির সাহায্যে খাবারের জারণ (oxidation) করতো। আমরা খাবার থেকে শক্তি আহরণের সময় oxidative phosphorylation প্রক্রিয়ায় তৈরী ইলেকট্রনগুলি শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্যে বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত করে দিই। অক্সিজেন থেকে অক্সাইড আয়ন বানিয়ে, তারপর প্রোটনের সঙ্গে বিক্রিয়া করিয়ে তাকে জলে পরিবর্তিত করি। অক্সিজেন না থাকার ফলে আগের সেই জীবাণুগুলি খাবার থেকে শক্তি আহরণের সময় তৈরী হওয়া ইলেকট্রনগুলি সালফেট জাতীয় যৌগের ভিতরে পাচার করে দিতো।

সালফেট আয়নের মধ্যে অবস্থিত সালফারের যোজ্যতা +৬। এর সাথে ৮-টি ইলেকট্রন যুক্ত করে সালফারের যোজ্যতাকে -২ (sulfide) করলে তা প্রোটনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন সালফাইড তৈরী করে। অক্সিজেনের উপস্থিতিতে শ্বাস-প্রশ্বাসে যেমন জল তৈরী হয়, ঠিক সেই ভাবেই এই জীবাণুরা অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে জলের সাথে সাথে সালফেট থেকে হাইড্রোজেন সালফাইড তৈরী করে বেঁচে থাকে।

$$SO_4^{2-} + 10H^+ + 8e^- \rightarrow H_2S + 4H_2O$$

কোনো ইলেকট্রিক সার্কিটকে কার্যকরী করতে সার্কিটটিকে আর্থ করা প্রয়োজন। যাতে ইলেকট্রনগুলিকে কাজের শেষে শোষণ করে নেওয়া যায়। শরীরের শক্তি তৈরীর যন্ত্রটিও কাজ করা বন্ধ করে দেয় যদি না উৎপন্ন ইলেকট্রনগুলি কাজের শেষে সরিয়ে ফেলা হয়। যে ইলেকট্রনগুলির উৎপত্তি হয় নানা কাজের মধ্যে দিয়ে, সবশেষে ঐ আর্থ করার প্রক্রিয়ায় সেগুলির শোষণ হওয়াটা অত্যন্ত জরুরী।

এই কাজটার জন্যে আমরা অক্সিজেন (aerobic respiration) ব্যবহার করে থাকি। আর যেসব জীবাণু পৃথিবীতে অক্সিজেন উৎপন্ন হবার আগেই এসেছিলো, তারা বিভিন্ন ধরণের যৌগপদার্থের ব্যবহার (anaerobic respiration) করে থাকে। তাই অক্সিজেনকে আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াতে টার্মিনাল ইলেকট্রন গ্রাহক (terminal electron acceptor) বলা হয়। একই ভাবে সালফেট আয়নটিকে এই ধরণের জীবাণুদের টার্মিনাল ইলেকট্রন গ্রাহক বলা যেতে পারে। যেহেতু তা উৎপন্ন ইলেকট্রনগুলির সদগতি করতে পারে।

নর্দমাতে এই জীবাণুদের দ্বারা উৎপন্ন হাইড্রোজেন সালফাইডের দুর্গন্ধের সাথেই আমরা পরিচিত।

নর্দমাতে এই জীবাণুদের দ্বারা উৎপন্ন হাইড্রোজেন সালফাইডের দুর্গন্ধের সাথেই আমরা পরিচিত। রাত্রির অন্ধকারে যে জীবাণুরা তাদের বাঁচার প্রক্রিয়ায় দুর্গন্ধযুক্ত হাইড্রোজেন সালফাইড তৈরী করে, তাদের বৈজ্ঞানিক নাম ডীসাল্ফোভিব্রিও (Desulfovibrio)। এই গোত্রের মধ্যে অনেক ধরণের জীবাণু আছে। চিত্র-d তে ব্যাকটেরিয়ার চিত্রটি Desulfovibrio desulfuricans G-20-র। এদের সালফেট রিডিউসিং ব্যাকটেরিয়া (SRB) বলেও ডাকা হয়ে থাকে। খাবার জারণের সময় এরা এই সালফার জাতীয় যৌগগুলিকে উৎপন্ন ইলেকট্রনগুলি দান করে জারণ-বিজারণের প্রক্রিয়াটিকে সম্পূর্ণ করে।

সূর্যের আলোতে এরা খাবার খায় না কেন? এই জীবাণুগুলো পৃথিবীতে অক্সিজেন উৎপন্ন হবার আগেই এসেছিলো, তাই অক্সিজেনকে এরা একদম পছন্দ করে না। অক্সিজেনের উপস্থিতি এদের মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

রাতের অন্ধকারে পৃথিবীতে সূর্যের আলো না পড়ার ফলে গাছ ও ঘাস সালোকসংশ্লেষ বন্ধ করে দেয়। বাতাসে নতুন করে অক্সিজেন সরবরাহ করে না। গাছপালারা তখন শুধু কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে মাটির কাছের বাতাসকে প্রায় অক্সিজেন-শূন্য করে দেয়। কার্বন-ডাইঅক্সাইড-এর হালকা আস্তরণে ঢেকে ফেলে। সেই সময় অক্সিজেনের ভয়ে মাটির গভীরে লুকিয়ে থাকা এই জীবাণুগুলি উপরে উঠে আসে নর্দমায় থাকা তাদের খাবার খেতে। সাধারণ জল সালফেট আয়নে ভর্তি, আর জীবানুগুলির খাদ্য কার্বনের যৌগগুলি তো মানুষের পরিত্যক্ত ও বর্জিত ভুক্তাবশেষ হিসেবে রয়েছে।

এদের খাবারের মাধ্যমে তৈরী হওয়া হাইড্রোজেন সালফাইড প্রথমে নর্দমার মাটির সঙ্গে যুক্ত বাদামী রঙের আয়রন (ferric; Fe(III)) অক্সাইডকে বিজারণ (reduce) করে সবুজ-কালো রঙের ফেরাস (Fe(II)) অক্সাইডে(FeO) পরিবর্তিত করে। পরে বেশী হাইড্রোজেন সালফাইডের প্রভাবে তা কালো ফেরাস সালফাইডে (FeS) রূপান্তরিত হয়।

$Fe_2O_3 + H_2S \rightarrow$	$FeO + H_2O$
বাদামী	সবুজাভ কালো
$FeO + H_2S \rightarrow$	$FeS + H_2O$
সবুজাভ কালো	কালো

বাড়তি হাইড্রোজেন সালফাইড তার পচা ডিমের গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে দেয়। ভোরের সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই খাওয়া-দাওয়া সালোকসংশ্লেষ-জাত অক্সিজেনের ফলে বিঘ্নিত হয়। প্রাণের ভয়ে এই জীবাণুগুলি আবার মাটির নীচে লুকিয়ে পড়ে আর পরের সন্ধ্যার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

নর্দমার মাটি কালো দেখায় ফেরাস সালফাইডের জন্যে। যখন নর্দমা থেকে সেটাকে উপরে তুলে ফেলা হয়, বাতাসের অক্সিজেনের প্রভাবে জারিত হয়ে সেটা আবার বাদামী রঙের ফেরিক অক্সাইডে (Fe_2O_3) পরিবর্তিত হয়।

> আজকাল আমরা এদের জন্য ফাস্ট ফুডের ব্যবস্থা করে ফেলেছি: জামা-কাপড় পরিষ্কার করার ডিটারজেন্ট।

আজকাল আমরা এদের জন্য ফাস্ট ফুডের ব্যবস্থা করে ফেলেছি: জামা-কাপড় পরিষ্কার করার ডিটারজেন্ট। টিওবওয়েলের সিমেন্ট বাঁধানো জায়গায় কাপড় কাচলে, ময়লা সহ ডিটারজেন্ট নর্দমার জীবাণুগুলির মহাভোজের খাবার হয়।

ডিটারজেন্টগুলি সাধারনত ১৩-১৪ টি অ্যালিফ্যাটিক কার্বন চেন দিয়ে তৈরী হয়। তার শেষ প্রান্তে একটা সোডিয়াম যুক্ত সালফোনেট গ্রুপ ($-SO_3Na$) লাগানো থাকে যাতে ডিটারজেন্ট জলে দ্রবণশীল হয়। এটা কিন্তু এই জীবাণুগুলির রেডিমেড খাবার। কার্বনের অংশটা খাবার আর সালফোনেট গ্রুপের সালফারের অংশটা ইলেকট্রন রাখার পাত্রের মত ব্যবহৃত হতে থাকে।

উন্নত দেশগুলিতে কাঁচা নর্দমা (open drainage) দেখা যায় না। ঢাকা অবস্থায় নর্দমার জল শোধাণাগারের মাধ্যমে পরিষ্কার করে মাঠের কৃষির কাজে ব্যবহৃত হয়। এতে মশার উপদ্রবও হয় না আর রাস্তাঘাট দেখতে পরিষ্কার মনে হয়। সন্ধ্যা বেলায় হাইড্রোজেন সালফাইডের দুর্গন্ধে আবহাওয়াও খারাপ হয় না। আমরা কি আমাদের শহর সেরকম রাখতে পারি না?

তবে হাইড্রোজেন সালফাইডের সবটাই খারাপ নয়। আমাদের শরীরে এটা খুবই কম মাত্রায় তৈরী করে থাকি। এটা না থাকলে আমরা অ্যাল্জহাইমার (Alzheimer) ও পার্কিনসন (Parkinson) নামক স্নায়ুর রোগে আক্রান্ত হতে পারি। এটা একেবারে অন্য একটা বিষয়, তাই পরে একদিন বলা যাবে।

লেখক পরিচিতি ('বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত হওয়ার সময়):

লেখক ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনীয়রীং সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনোলজি, শিবপুর -এর অধ্যাপক। এর আগে অধ্যাপনা করেছেন আই. আই. টি. , কানপুর-এ।

ছবি:

- প্রচ্ছদ: The Hindu
- Desulfovibrio desulfuricans G-20-র ছবি:Lawrence Berkley National Laboratory

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন http://bigyan.org.in/2015/04/19/stench-in-drains-at-night/

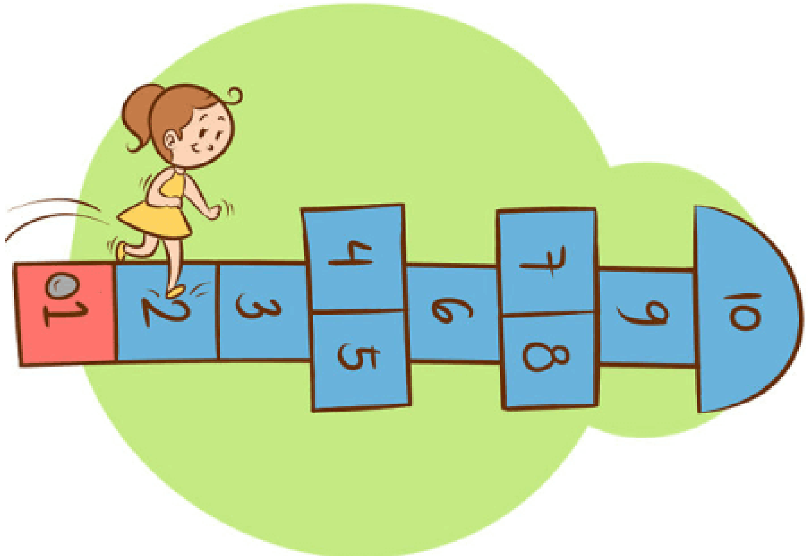

অঙ্ক কি শক্ত

পার্থসারথি মজুমদার

কথাটা 'অঙ্ক কিইই শক্ত' বললে হয়ত সব স্তরের স্কুল পড়ুয়ারাই সহমত হত।

ইংরিজি, বাংলা, ইতিহাস বা ভূগোলের তুলনায় অনেক বেশী সংখ্যায় ছাত্রদের পক্ষে অঙ্ক যেন একটা বিভীষিকা। ফলে অভিভাবকেরাও অঙ্কের 'ভাল' শিক্ষক খুঁজতে খুঁজতে হয়রান। অথচ এটাও সবাই জানে যে অঙ্কই সেই বিষয় যেটা আয়ত্ত করতে মুখস্থ করার থেকে বুদ্ধির দরকার বেশী, এটাই একটিমাত্র বিষয় যেটাতে পরীক্ষায় ১০০-য় ১০০ পাওয়া যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। তা হলে, সমস্যাটা কোথায়?

হয়তো গোড়াতেই। যুক্তিনির্ভরতার বদলে স্মৃতিনির্ভরতার সংস্কার কিন্তু বেড়েই চলেছে। কম্পিউটারের ভাষায় বললে: CPU-এর বদলে RAM-এর ব্যবহার বেশী। অনেকেরই ধারণা এইরকম, কোনও কিছু বোঝার চেষ্টার চেয়ে সেটা আদ্যন্ত মুখস্থ করে ফেলা সহজ। অসুবিধে এই যে অঙ্কের ক্ষেত্রে না বুঝে মুখস্থ করা অতি কষ্টসাধ্য। অতএব, বিড়ম্বনা। ভালো 'অঙ্ক-স্যার' ধরে আনতে ছোটাছুটি।

সমস্যাটা শুরু হয় একদম গোড়াতে, যখন বাচ্চাদের গুনতে শেখানো হয়। প্রায় সব স্কুলেই প্রাথমিক পর্যায়ে গোনা শেখানো হয় জিনিসের মাধ্যমে: ১-টা আম, ২-টো বল, ৩-টে গাড়ী ইত্যাদি। ধরে নেওয়া হয় যে বাচ্চারা আম, বল বা গাড়ীর সঙ্গে পরিচিত, তাই এটাই সহজ। যেন, ১, ২, ৩ সংখ্যাগুলির ঐ জিনিসগুলো ছাড়া আলাদা কোনও অস্তিত্বই নেই। তাই, ১ থেকে ১০০ গোনা বেশ একটা শক্ত ড্রিল হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, সংখ্যার সঙ্গে জিনিসের যে একাত্মতা গোড়াতে শেখানো হয়েছে, সেই যুক্তি দিয়ে গোনার কাজটা হচ্ছে না! অতএব, আবার সেই স্মৃতিনির্ভরতা – টেনে মুখস্থ।

আপনি বলবেন: উপায় কি? সবাই তো এই ভাবেই শেখে। হয়ত। কিন্তু একবার ভাবুন তো – কি অপূর্ব এই সংখ্যার জগৎ! যেখানে ইংরিজি শিখতে ২৬টা আলাদা বর্ণ শিখতে হয়, বাংলা বা হিন্দি শিখতে হলে স্বর ও ব্যাঞ্জনবর্ণ নিয়ে প্রায় গোটা পঞ্চাশেক, তাও যুক্তক্ষর তো ধরাই হল না, সেখানে অঙ্ক শিখতে দরকার মাত্র ১০টি চিহ্নের - ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ০। এই ১০টি চিহ্ন দিয়ে বিশ্বের যাবতীয় পূর্ণসংখ্যা লেখা যায়। এই হল আমাদের আবিস্কৃত 'দশমিক পদ্ধতি'-র মাহাত্ম্য। আমাদের সন্তানদের এই মহান কীর্তির কথা না শিখিয়ে শুধু মুখস্থ করালে পাপ হবে না?

আদপে কিন্তু বাচ্চারা গুনতে শেখে খেলার মধ্যে দিয়ে। 'এক্কা-দোক্কা' ছোট মেয়েদের মজার খেলা। এবার যদি বলি, শুরুটা হচ্ছে ০, তারপর এক লাফ - 'এক্কা' – মানে ১, বুঝতে অসুবিধা নেই। এবার ১-এর পর আরো ১ লাফ, অর্থাৎ 'দোক্কা', এটার মানে ০ থেকে ২। এর মধ্যে দিয়ে এটাও কি বলা হল না : ১ + ১ = ২। অর্থাৎ, যোগ করা শেখানো শুরু। এবার সাবেকী 'এক্কা-দোক্কা' থেকে বাড়িয়ে আরো এক ধাপ লাফালে শুরু (০) থেকে সেটা ৩, অর্থাৎ ২ + ১ = ৩। এইভাবে ০ থেকে ৯, ১ যোগ করে করে, শেখানো যেতেই পারে। খেলা বলে বিভীষিকার সম্ভাবনা নেই, মুখস্থের দরকার নেই।

শুধু তাই নয়, ধরুন আমার মেয়ে এক এক করে ৮-এর ধাপে পৌঁছেছে। এবার তাকে জিজ্ঞেস করি: আচ্ছা বলতো, এক ধাপ সামনে না লাফিয়ে পেছনে লাফালে শুরু থেকে কত নম্বর ধাপে পৌঁছবি? সহজ উত্তর: ৮এর ধাপের আগে সে তো ৭-এর ধাপ পেরিয়ে এসেছে, তাই সে অকাতরে বলবে '৭', অর্থাৎ সে আমাকে বলে দিল ৮ – ১ = ৭। অর্থাৎ বিয়োগ শেখা শুরু, প্রায় নিজে-নিজে। সম্পূর্ণ যুক্তিনির্ভর সে!

এই যে 'এক্কা-দোক্কা' পদ্ধতি, গণিতজ্ঞ মাত্রেই জানেন, এটাই 'এক মাত্রার জাফ্রী' (one dimensional lattice) দিয়ে পূর্ণসংখ্যার জ্যামিতিক রূপদর্শনের সর্বস্বীকৃত উপায়। অথচ, আমার বা আপনার ৪ বছরের মেয়েকে সেটা বোঝানো শক্ত নয়। এটাই অঙ্কের বৈশিষ্ট্য।

এবার ৯-এর ধাপ পৌঁছলে প্রশ্ন উঠবে : পরের ধাপটা কি? 'দশমিক পদ্ধতি'-র আরও একটা অপূর্ব আবিস্কার: ৯ + ১ = ১০। অর্থাৎ, শুরু ০-র মত আবার একটা শুরু। শুধু আগের শুরু ০ থেকে যে আমরা ৯ ধাপ এসে আরও এক লাফিয়েছি, সেটা মনে রাখতে হবে। এর পর আবার আগের মত: ১০-এর পর এক ধাপ মানে ০-র জায়গায় ১, অর্থাৎ ১১। এই এক এক করে একই ভাবে ১৯ অবধি। তারপর আবার নতুন জিনিস : ১৯ + ১ = ধাপটা কি? উত্তর: বাঁ দিকের ১টা ২ হয়ে গিয়ে আবার ০ থেকে শুরু: অর্থাৎ ২০। এই ভাবে ৩০, ৪০, ... ১০০। যুক্তি দিয়ে তৈরী হচ্ছে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম অসুবিধে হল এই যে সেটা অত্যন্ত পরোক্ষ বা নির্লিপ্ত। অর্থাৎ ছাত্রদের কে কতটা কী করতে পারল, সেদিকে কোনও নজর নেই। সিলেবাস শেষ করাই তার মহৎ উদ্দেশ্য। সেই সিলেবাস পরে কেউ কিছু শিখছে কি না, তা তলিয়ে দেখার ধৈর্য্য কারুরই নেই। নিজে 'করতে করতে শেখা' ব্যাপারটা আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি থেকে বিতাড়িত। তাই ক্লাসে প্রশ্ন করলে দলছুট ছাত্র সহপাঠীদের কাছে ধমক খায় 'সময় নষ্ট করিস না', 'কি বোকার মত জিজ্ঞাসা করছিস, এটাও জানিস না' ইত্যাদি। করতে করতে শেখার মানেই অনেক প্রশ্ন করা, আলোচনা করা, তর্ক করা, নিজে

প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে থাকা, কে কত মুখস্থ-করা জ্ঞান ফলাতে পারে তার প্রতিযোগিতা নয়। এই ভাবে কি অঙ্ক-বিভীষিকা দূর করা যায় না?

লেখক পরিচিতি ('বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত হওয়ার সময়):

লেখক থিওরেটিকাল ফিজিক্স বা তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি। দীর্ঘদিন সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স আর ইনস্টিটিউট অফ ম্যাথেমেটিকাল সাইন্সেস, এই দুটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে উনি রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক। তবে গবেষক ছাড়াও আমরা অনেকেই তাঁকে ভালোভাবে চিনি শিক্ষক হিসেবে। পড়ানোর অদম্য নেশা তাঁর। হাই স্কুল থেকে পি.এইচ.ডি., যেকোনো স্তরের ছাত্রছাত্রীদের সাথে পদার্থবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করতে উনি খুবই উৎসাহী। শুধু সরাসরি শিক্ষাদানই নয়, উনি এখন বিবেকদিশা বলে একটি ই-লার্নিং প্রচেষ্টার সাথেও যুক্ত।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন

http://bigyan.org.in/2015/06/29/is-math-difficult/

লেখা দিতে হলে

বৈদ্যুতিন লোকবিজ্ঞান (Popular Science) পত্রিকা বিজ্ঞান (http://bigyan.org.in)-এর বিভিন্ন বিভাগগুলিতে বিষয়ভিত্তিক লেখার জন্য আমরা সকলকেই আমন্ত্রণ জানাই।

বিজ্ঞান-এ লেখা পাঠানোর আগে লেখক অবশ্যই রচনার নিয়মাবলীটি পড়ে দেখুন।

আমরা যে ধরণের লেখা পেতে আগ্রহী

- বিজ্ঞানের (ব্যাপক অর্থে – গণিত ইত্যাদি সহ) কোন ধারণা বা concept-এর সহজ এবং অভিনব ব্যাখ্যা। যা সহজে পাঠ্য পুস্তকে পাওয়া যায় না অথবা অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকে ভালভাবে বর্ণনা করা থাকে না। লেখকদের কাছে অনুরোধ আপনারা সাধারণ রচনাধর্মী লেখা পাঠাবেন না।
- কোন উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানীর জীবনের কিছু ঘটনা, যা পড়ে তাঁর গবেষণা ও তার পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে কিছু জানতে পারি। উইকিপিডিয়ার রচনামূলক ধাঁচের বদলে, কোন বিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক অবদান এবং সেই আবিষ্কারের তাৎপর্যের উপর সংক্ষিপ্ত লেখাগুলো সাধারণত সুপাঠ্য ও আকর্ষণীয় হয়।
- কোন গবেষণার বিষয়ের বর্ণনা যা পাঠককে সেই বিষয়ে আরো জানতে অনুপ্রাণিত করবে। এক্ষেত্রে খুব বেশী টেকনিক্যাল টার্ম না ব্যবহার করা বিধেয়।
- নিজে কর – সহজে বাড়িতে বা স্কুলে তৈরী করা যেতে পারে বা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে এমন কোন বিষয়!
- বিজ্ঞানের কোন বিশেষ সমস্যা, যা বহুদিন ধরে বিজ্ঞানীদের ভাবাচ্ছে/ভাবিয়েছে তার বর্ণনা।
- বিজ্ঞানের খবর বা বিজ্ঞানের কোন বিষয় যা বর্তমানে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, যেমন জলবায়ুর পরিবর্তন ইত্যাদি। এইধরণের বিষয়ে নতুন কোন আবিষ্কার বা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি কাম্য। কেবল মাত্র সমস্যার সাধারণ বর্ণনা যা উইকিপিডিয়ায় পাওয়া যাবে তা নয়।
- বিজ্ঞান বা অঙ্কের মজার ধাঁধা।

কিছু নিয়মকানুন

- লেখাটি বিজ্ঞানভিত্তিক হতে হবে। মেটাফিজিক্স জাতীয় লেখা পেতে আগ্রহী নই আমরা।
- লেখাটিকে এক হাজার শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখুন। তবে লেখার বিষয়বস্তুর উপযুক্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজনে এর থেকে বড় লেখা লিখতে হলে সম্পাদকদের সাথে লেখা জমা দেওয়ার আগে আলোচনা করে নিন (bigyan.org.in-at-gmail-dot-com)।
- রাজনৈতিক বা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সমালোচনামূলক লেখা দয়া করে পাঠাবেন না।
- সম্পাদক মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবাচিত হবে।
- লেখাতে যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক তথ্যের উৎস উল্লেখ করার অনুরোধ জানাচ্ছি। এছাড়াও লেখার শেষে প্রাসঙ্গিক কিছু লেখা বা ভিডিও-র লিঙ্ক দিলে কৌতূহলী পাঠকের উপকারে আসবে।

লেখার খুঁটিনাটি

- প্রতিটি লেখা বাংলা হরফে (Unicode) Google doc ফাইল হিসেবে ই-মেল-এ জুড়ে পাঠাতে হবে। ছবির ক্ষেত্রে best possible resolution-এ পাঠাতে হবে।
- ই-মেল-এ বিষয় এবং কোন বিভাগের জন্য লেখা পাঠাচ্ছেন তা উল্লেখ করুন। সেই সাথে আপনার সম্পূর্ণ নাম এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানান।
- ই-মেল করুন bigyan.org.in@gmail.com-এ।